বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত
একটি সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

সপ্তদশ বর্ষ □ চতুর্থ সংখ্যা | অক্টোবর-ডিসেম্বর 1995 | পাঁচ টাকা

এই সংখ্যায়

সূর্যগ্রহণের ডায়েরী

গ্রহণ চশমার ভালোমন্দ

নির্যাতিতা নারী

বিষয় পরিবেশ : বাতাসের ময়লা আঁচল

শ্রমিকদের উদ্যোগে হাসপাতাল

ভুপালের কান্না

খৃসমাসে ফরাসী উপহার

আমাদের কথা

একে লিটল ম্যাগাজিন, তায় বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক। এরকম একটি পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস আজকের দিনে বোধহয় চূড়ান্ত পাগলামিরই নামান্তর। তবু, এহেন পাগলামির জন্যও দু'চারজন কর্মী থাকে, ক্ষুদ্র হলেও উৎসাহী আগ্রহী এক পাঠকমণ্ডলী থাকে, এও তো কম আশ্চর্য নয়। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর' ক্ষেত্রে এমনই আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে চলেছে আজ সতেরো বছর ধরে। মরতে মরতে, বন্ধ হতে হতেও হয় না। কতবার যে এমন হলো।

যে কয়েকজন কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমে পত্রিকা বার হয়, গ্রাহক-পাঠকের হাতে পৌঁছয়, তাদের মধ্যেও কাউকে না কাউকে নিতেই হয় একটু বেশী দায়িত্বের বোঝা। কিন্তু সেই কর্মী যদি হঠাৎই পড়ে কোন ব্যক্তিগত বিপাকে—যা খুবই স্বাভাবিক—তাহ'লেই তখনকার মত পত্রিকাও পড়ে যায় সংকটে। এরকমই এক সংকটে পড়ে পত্রিকা আবার একটু পিছিয়ে পড়লো। গত দুবছর আমরা বইমেলায় হাজির হতে পেরেছি নতুন বছরের নতুন সংখ্যা নিয়েই। এবার তার ব্যতিক্রম হ'লো। অক্টোবর—ডিসেম্বর '৯৫ সংখ্যাটি অবশেষে আমরা প্রকাশ করতে পারলাম জানুয়ারীতে। তবুও ভালো লাগছে। বইমেলা শুধু বাণিজ্যের ব্যাপার নয় লিটল ম্যাগাজিনগুলোর কাছে। হঠাৎ যখন কোন দূর মফস্বলের গ্রাহক দেখা করে অভিনন্দন জানান, পুরনো সংখ্যার খোঁজ করেন, খোঁজ করেন পুরনো বন্ধুর, কিংবা হয়তো অনুযোগই করেন পত্রিকা ঠিকমত না পাবার জন্য, তখন—সত্যি বলতে কি

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

লেখা, রিপোর্ট পাঠানো বা অন্যান্য যে কোন কারণে যোগাযোগ

(1) অভিজিত লাহিড়ী
পি—252, লেক টাউন, ব্লক-এ,
কলিকাতা-700 089
ফোন—34-7982

(2) সুভাষ গাঙ্গুলী
বি-22/8, করুণাময়ী
হাউজিং এস্টেট, সল্ট লেক,
কলিকাতা-700 091
ফোন—359-0297

সূচীপত্র

সূর্যগ্রহণের দিনলিপি / বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত—1 ☐ গ্রহণ চশমা নিয়ে বিতর্ক ঃ এক নজরে ঘটনাপ্রবাহ—12 ☐ গ্রহণ চশমার ভালোমন্দ / রবীন চক্রবর্তী—14 ☐ বেলুড় শ্রমজীবি হাসপাতাল / অসিত পুরকাইত—16 ☐ বিষয় পরিবেশ ঃ দূষণের মাপ ও মাত্রা (বায়ু দূষণ)—18 ☐ নিরাশ্রয় নিঃসঙ্গতায় দিন গুনছেন যারা/কাজল রায়—26 ☐ ভূপালের কান্না থামেনি আজও / র.চ.—29 ☐ BA (Love) Hons কোর্স—30 ☐ খুসমাসে ফরাসী উপহার

—ভালো লাগে, উৎসাহ ফিরে পাওয়া যায়। কুড়িয়ে খুঁটিয়ে জোটে কিছু পাথেয়—কিছু সুপরামর্শ, হয়তো বা সমালোচনাও। ভেবে উজ্জীবিত হতে হয়—এই ম্যাগাজিনের মড়কের দিনেও পাগলা বন্ধু ছড়িয়ে আছে। কোথাও অসীম আগ্রহী, ক্ষমাশীল সেইসব বন্ধুদের কাছে আবারও একবার ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমরা চলছি, আশা করি চলবও।

পঁচানব্বই ঢুকে গেল ইতিহাসে। কত স্মৃতি কত ঘটনা—কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে পঁচানব্বই স্মরণীয় হয়ে থাকবে ভারত ভূখণ্ডের কোনো কোনো জায়গা থেকে দৃষ্ট সূর্যের পূর্ণ গ্রহণের কারণে। সংস্কার—কু বা সু, আধুনিকতা—কু বা সু, বিজ্ঞানমনস্কতার—কু এবং সু'র দ্বন্দের চরম প্রকাশ ঘটল সূর্যগ্রহণ দেখা না দেখাকে কেন্দ্র করে। হঠাৎই যেন এক জোয়ার এসেছিল—তর্কে বিতর্কে, করণীয়ে অকরণীয়ে। ঠিক একই জায়গায় পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হতে কেটে যাবে আরও চারশো বছর। ততদিনে অনেক কিছুই আর থাকবে না আজকের মতো, পৃথিবীও কি থাকবে? কেউ জোর দিয়ে কিছু বলতে পারবে না। তবুও পৃথিবী থাকবে, থাকবে সভ্যতা-সংস্কৃতি, ঘটবে আরও উন্নতি। এসব ধরে নিয়ে বলা যায়—আজ যা ঘটে গেল তা আগামী দিনের ইতিহাস। অথচ আশ্চর্য, সূর্য গ্রহণের যত ছিল তাপ-উত্তাপ-উত্তেজনা, পরে তা হয়ে গেলো ততোধিক নিরুত্তাপ নিস্তেজ। বিজ্ঞানীরা হয়তো তাঁদের তথ্যের বিশ্লেষণ করবেন, সংগৃহীত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হবে গুরু-গম্ভীর জার্নালে, কিন্তু সাধারণ মানুষের বৈজ্ঞানিকবোধের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি ঘটলো কি বা কতখানি? সেদিক থেকে বিচার করলে এবার আমরা গ্রহনোত্তর যে রচনা-পর্যালোচনা প্রকাশ করতে পারলাম এই সংখ্যায় তার কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকবে বলে মনে হয়।

সাধারণ মানুষ কুসংস্কারগ্রস্ত 'বিজ্ঞানী' বা 'জ্ঞানী'কেও উপেক্ষা করে, নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে, বিরল এবং অত্যাশ্চর্য এই নৈসর্গশোভা যে উপভোগ করেছেন, সে সচেতনতার জন্য কৃতিত্ব যদি দিতেই হয় তবে তা প্রাপ্য ঐ সব সাধারণ মানুষেরই, আর প্রাপ্য সেই সব বিজ্ঞানকর্মীর যারা গত প্রায় দুদশক ধরে স্বতস্ফূর্তভাবে কাজ করার ধারা অব্যাহত রেখে চলেছেন—শহরে-গ্রামে, পাড়ায়-ক্লাবে। অবশ্য আমাদের ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না এ সত্য।

এ সংখ্যায় আরো থাকছে নিয়মিত সব বিভাগ। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র সহৃদয় পাঠকদের কাছ থেকে আলোচনা মতামত লেখা পেতে বরাবরের মতই আগ্রহী থাকবো।

পূর্ণ সূর্য গ্রহণের দিনলিপি

[দিনলিপি বা ডায়েরি লেখার অভ্যাস গড়ে উঠেছে লক্ষ্মীকান্তপুরের নবীনের। নবীন পড়ে দশম শ্রেণীতে। পূর্ণ সূর্য গ্রহণের আগের ও পরের কয়েকদিনে লেখা তার ডায়েরির কিছু অংশ প্রকাশ করা যাচ্ছে। অবশ্য ডায়েরি লেখক নবীন না হয়ে পড়ুয়া বা অপড়ুয়া অমল বিমল কমল অথবা ইন্দ্রজিত-যে কেউ হতে পারে।]

15.10.95 : আর মাত্র কটা দিন। মাঝে আট দিন মাত্র। বেশ রোমাঞ্চ হচ্ছে। যে নিসর্গশোভা আমার অনেক পূর্ব-পুরুষ দেখতে পান নি, আমি তা দেখব। গত মাসের তিন তারিখে বিকালে বেশ সুন্দর এক আলোচনা সভাতে গিয়েছিলাম। বিষয় ছিল আসন্ন পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। আমাদের এলাকায় ছটি সমাজসেবী সংগঠন মিলে এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। মন্দিরবাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি, যাযাবর নাট্য সংস্থা, রামকৃষ্ণ সারদা বাহিনী, প্রয়াসী গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র ও শিশু উদ্যান এবং বিবেকানন্দ সেবা সমিতি। সাংঘাতিক ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে গ্রামের মানুষেরা শুনতে এসেছেন আলোচনা সভা। শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুব শিশু বৃদ্ধ নানা ধরণের শ্রোতা। সব মিলিয়ে প্রায় 150 জন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন ডঃ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আগে ছিলেন কোলকাতার পজিশনাল এ্যাস্ট্রোনমি সেন্টারের প্রধান। অবসর গ্রহণ করে এখন বিড়লা প্লানেটোরিয়মের সাথে যুক্ত, সিনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসাবে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সাদা দেওয়ালের গায়ে স্লাইডের ছবি ফেলে কেমন সুন্দর করে বোঝালেন চন্দ্র গ্রহণের, সূর্য গ্রহণের কারণগুলি। কত নতুন নতুন কথা শিখলাম। মুক্তামালা, হীরার আংটি, ছায়ালহরী, বর্ণমন্ডল, বর্ণালীর ঝলক, সৌর শিখা, ছটা মণ্ডল— আরো কত কি!

এই আলোচনা সভা হয়েছে ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার সৌজন্যে। তাঁরা দেখালেন ভিন্নতর এক অনুষ্ঠান। এটা বাড়তি পাওনা। ফাউ। সাপ নিয়ে যত কুসংস্কার রয়েছে আমাদের মধ্যে তার বিরুদ্ধে এঁদের লড়াই। সত্যিকারের জ্যান্ত কেউটে দেখে কয়েকটা মেয়ে আলোচনা সভা থেকে ভয়ে পালিয়ে গেল। না, বাড়িতে নয়। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। আসার পথে বৃষ্টির জলে ভিজে গিয়েছিলাম। এক ভাঁড় গরম চা পেলাম। ধন্যবাদ।

16. 10.95 : শোনা যাচ্ছে পূর্ণ গ্রহণের সময় আমাদের এখানে প্রায় 1 মিনিট 18 সেকেন্ড মাত্র। ঠিক ঐ সময় খালি চোখে সূর্যকে দেখা যাবে। ভয় নেই। আর দেখা যাবে স্বাতী ও চিত্রা নক্ষত্র। বুধ ও শুক্র গ্রহ। ওরে বাবা, দিনে তারা দেখবো! শুনতে পাচ্ছি অদ্ভুত এক আলোয় ঢেকে যাবে চারদিক। পূর্ণ গ্রহণ কালে পূর্ণ অন্ধকার হবে না। তবে গোধূলির যে রূপ আমরা দেখি সূর্যোদয়ের আগে পূর্বের আকাশে বা সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম আকাশে, শুধু আকাশের সামান্য অংশে, এবারে সেই রূপের গরিমাতে ঢেকে যাবে আকাশের সবটা! পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ মাথার উপর সবটা! প্রচ্ছায়া দিয়ে আবৃত জায়গাতে উপচ্ছায়া অংশের আলো ঢুকে পড়বে কিছু। তৈরী করবে এক মায়াভরা আলোর যাদু। মনে হবে বিশাল অর্ধগোলকের মধ্যে

রয়েছি যার গায়ে একটা কালো ফুটো! ছি ছি গতকাল বৃষ্টি হয়েছে। আকশের বিবেচনা শক্তি কম! ভালো থাকবে তো চব্বিশ তারিখে? দেখা যাক।

17.10.95 : আজ মঙ্গলবার। আগামী মঙ্গলবারেই ঘটছে সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ। বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার কর্মীরা প্রচার করছেন। সভা সমিতি সেমিনার হচ্ছে। চশমা বিক্রির ধুম পড়েছে। 1980 সালের ছবি এবারে নাকি কিছু পরিবর্তিত হতে চলেছে। মানুষ অনেক কুসংস্কার মুক্ত হচ্ছেন —বলছেন বড়দের কেউ কেউ। গ্রহণ দেখতে যাবার হিড়িক পড়েছে। কেউ ডায়মন্ডহারবার। কেউ পুরুলিয়া। কেউ ভরতপুর। কেউ আগ্রা বা এলাহাবাদ। আমাদের গ্রামে সমীরদা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকা এনেছে। এতেও সূর্য গ্রহণ নিয়ে একটা সুন্দর লেখা বের হয়েছে। এক দমে পড়ে ফেলার মত। চাঁদের 400 গুণ বড় সূর্য। আবার পৃথিবী থেকে চাঁদ যত দূরে আছে তার প্রায় 400 গুণ দূরে আছে সূর্য, পৃথিবী থেকে। এই 400'র ব্যাপার আছে বলে আমরা গ্রহণ দেখতে পাচ্ছি। বড় মজার ব্যাপার! এই 400 এর কান্ড না থাকলে ফসকে গেছিল আর কি! এ্যাঁ, শুধু চোখ নয় সব ইন্দ্রিয় সজাগ রাখতে হবে? লেখক লিখেছেন— পূর্ণ গ্রাস গ্রহণ দেখে মানুষই চমকায় এমন না। গোটা জীবজগতেই এর প্রভাব পড়ে। আচ্ছা দেখা যাবে। কতটা সজাগ থাকতে পারি! ঐ সময়ে তাপমাত্রাও কমে যাবে? কিন্তু আকাশ? ভরসা পাচ্ছি না। গতকালও বৃষ্টি হয়েছে 0·6 মিমি। Science Reporter পত্রিকা আনল মেজকাকা। অমলেন্দবাবু প্রবন্ধ লিখেছেন— Watching the eclipse where? বলছেন দক্ষিণবঙ্গে আকাশ অক্টোবরের ঐ সময়ে মেঘাবৃত থাকার সম্ভাবনা 50 শতাংশ। গণণা করে নির্ভুল বলা যাচ্ছে সূর্য গ্রহণের সময়, অনেককাল আগে। কিন্তু আগামীকাল আবহাওয়া কি থাকবে তা নির্ভুল বলা যাবে না! উরে বাবা! তা হলে চশমা কিনে কি হবে?

18. 10. 95 : সকালে ঘুম থেকে উঠেই তাকালাম দূরের আকাশে। সূর্য নেই। মেঘ। মনটা বিবর্ণ হয়ে গেল। ছোট্ট বোন মিলি লাফাতে লাফাতে এসে বলল—'জানো দাদা, টি. ভি. প্রোগ্রাম হবে সূর্যগ্রহণ নিয়ে। আবার মনে আশা হল। বেশ, আমাদের আকাশ যদিও মেঘলা থাকে রাজস্থানের, বা উত্তর প্রদেশের আকাশ তো ভাল থাকবার কথা। সেখান থেকে যদি দূরদর্শনে সূর্যগ্রহণ দেখায় ভালই হবে। তবে এমন জিনিষটা নিজে এখানকার আকাশে দেখতে পাবো না? দাদু বললেন— ওরে নবীন, জানিস তো রামায়ণে সূর্যগ্রহণের ব্যাপার আছে? বললাম কই—না তো। দাদু বললেন— 'দেখিস্—'লংকাকান্ডে'। রাবণের শক্তিশেলে মৃত লক্ষণকে বাঁচাতে হবে। সকাল হবার আগেই। রাবণের আদেশে সূর্য যাচ্ছেন উদয়গিরি। পথে হনুমানের সাথে দেখা। হনুমান বের হয়েছেন লক্ষণকে বাঁচাবার জন্য বিশল্যকরণী আনতে। পথে দুই জনের দেখা। বাদানুবাদ যুদ্ধ সন্ধি। তারপর—

"সূর্যেরে ধরিয়া হনু করে কোলাকুলি।
সাপটিয়া সূর্যের পুরিল কক্ষতালি।।
মহাতেজময় সূর্য কে রাখিতে পারে।
আপনি হইল বন্দী লক্ষণের তরে।।"

এই হল সূর্যগ্রহণ শুরু।

আমি বললাম—বেশ বেশ। আর গ্রহণমুক্তি?

দাদু বললেন—হ্যাঁ তা তো থাকতেই হবে। হনুমান ফিরেছে। রাম বড় বিবেচক। সূর্যের এই অবস্থা দেখে হনুমানকে বললেন—

"সূর্যের উদয় জন্য সংসার প্রকাশে
ছাড়হ ভাস্করে উনি উঠুন আকাশে"

তখন হনুমান করলে কি?

রামের বচনে বীর তোলে দুই হাত।
বাহির হৈলেন তবে জগতের নাথ।।

বাঃ কি মজা! বেশ ভাল লাগছিল।

এই তো আজকের কাগজ এসে গেছে। আবহাওয়া কি বলছে। বলছে "বুধবার আকাশ প্রধানতঃ পরিস্কার থাকবে। দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। গত চব্বিশ ঘন্টায় বৃষ্টিপাত সামান্য হয়েছে।" আকাশ তাহলে ভালোর দিকে যাচ্ছে। মনটা খুশি খুশি হয়ে যাচ্ছে। পাশের বাড়ির সঞ্জীব উৎস মানুষ পত্রিকা দিয়ে গেল। কী মজা! শ্রুতি নাটক— "গ্রহণে জিলাপি ভক্ষণ"। লিখেছেন পাচু রায়। ভালই লাগলো। ময়রার

দোকানের বিক্রিবাটা বাড়ুক। ভালই তো।

19.10.95 ঃ সৌর চশমার আকাল পড়েছে। সুযোগ বুঝে তা আবার জাল হচ্ছে। এডুকেশনাল সেন্স এম্পোরিয়াম নামে এক কোম্পানী যে চশমা বিক্রি করছে তা নিয়ে কথা উঠেছে। ওদেরটা নাকি পরীক্ষিত নয়।

একটু পদার্থ বিদ্যার বই পড়া যাক। আলো হচ্ছে তরঙ্গ। তড়িচ্চুম্বকীয়। সূর্যের আলোর ভিতরে কত তরঙ্গ। লং ওয়েভ। শর্ট ওয়েভ। মিডিয়াম ওয়েভ। মাইক্রো-ওয়েভ। অবলোহিত। দৃশ্য আলোক। অতি বেগুনী। রঞ্জন রশ্মি। গামা রশ্মি।

যে ফিলটার অবলোহিত, দৃশ্য আলোক আর অতিবেগুনী তরঙ্গের বিশাল অংশকে প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে দিতে পারে চোখে পড়বার আগে, তা ব্যবহার করা নিরাপদ। চোখে এসে পড়বে মাত্র 100000 ভাগের একভাগ। এতে ভয় থাকবে না।

আজও আকাশ মেঘলা থাকবে। কোন কোন জায়গাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। গতকাল বৃষ্টি হয়েছে 13.4 মি মি। সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ হয়তো আর দেখা হবে না।

এদিকে আর এক সাংঘাতিক ব্যাপার শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জরুরী নির্দেশ পাঠিয়েছেন গ্রহণ দেখা চলবে না। চশমা পরেও নয়। চোখের ক্ষতি হবে। গতকাল মানে বুধবার বিকালে মহাকরণে ওই খবর এসেছে। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শহরের চক্ষু বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন মহাকরণে আগামীকাল। দেখা যাক কি হয়। এঁরা এতদিন কি করলেন ?

20. 10. 95. ঃ সকালে উঠে আকাশ দেখব কি তার আগে কাগজ দেখে চোখ ছানা বড়া। স্বাস্থ্যমন্ত্রী পঃ বঙ্গ, নিষেধ করেছেন গ্রহণ দেখতে। বলেছেন কোনো চশমাই নিরাপদ নয়। বিতর্ক বেধেছে খুব জোর। চশমা বিক্রি হয়েছে এ পর্যন্ত 2 লাখের বেশি। বড় এক রাজনৈতিক নেতা (ইনি আবার তরমুজ নামে খ্যাত) দাবী করেছেন—চশমার দাম ফেরত দিতে হবে। চশমা যারা বিক্রি করেছিল বা এখনো করছে তারা সাফাই গাইছে। গত কয়েকদিনে কোন কোন মহলে থেকে দাবী উঠেছিল গ্রহণ দেখার জন্য ছুটি দিতে হবে। রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশ শুনে ছুটি দেবেন না বলে জানাচ্ছেন। শ্রম দিবস নষ্ট হবে বলে যুক্তি দেখাচ্ছেন এক শ্রমিক নেতা। এক প্রাবন্ধিক বলছেন—"গ্রহণ দর্শন সকলের পক্ষে বৈধ নয়। যাঁদের বিশেষ জন্মরাশি, মাত্র তাঁরাই গ্রহণ দেখতে পারেন। আগামী চব্বিশে অক্টোবর যে গ্রহণ হচ্ছে, তা মাত্র বৃষ, মিথুন, সিংহ, কন্যা ও ধনু রাশির পক্ষেই বৈধ। গ্রহণ দর্শন মাত্র তাঁরা সুফল পাবেন। এ ছাড়া অন্য রাশির পক্ষে গ্রহণ দর্শন অশুভ। তবে যে সব রাশির পক্ষে গ্রহণ দর্শন বৈধ, তারা যদি মৃগশিয়া আদ্রা ও চিত্রা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন তবে তাঁদের পক্ষেও গ্রহণ দর্শন নিষিদ্ধ! (সাপ্তাহিক বর্তমান—21. 10. 95)। এ দিকে হাওড়া পন্ডিত সমাজ ভবনে আসন্ন সূর্য গ্রহণ নিয়ে এক সভা হয়েছে জ্যোতীষিদের। বিজ্ঞানীদের মন্তব্য দুঃখজনক ও শাস্ত্রবিরোধী বলে আখ্যা দিয়েছেন তাঁরা। তাঁরা আরো বলেছেন—জীবানুদুষ্ট পৃথিবীতে স্থালি পাকের অন্ন খাওয়া উচিত নয়। মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নয় "গ্রহণ কালে।" বাপ রে বাপ! সব মিলিয়ে পাগলা করে দেবে। কোথাকার এক পীরবাবা বলেছেন খালি চোখে গ্রহণ দেখতে। উড়িষ্যার উপকূলে আবার নিম্নচাপ। গোলদার মহাশয় বলছেন ওটা আমাদের এখানেও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

21.10.95 ঃ ত্রিপুরাতে গ্রহণ দেখা নিয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা জারি হয় নি। সেখানে খিচুড়ি উৎসব হবে। বিজ্ঞান সংগঠন ও বিজ্ঞানীরা দরবার করেছেন আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে। আগামীকাল শনিবার আবার বৈঠক হবে মহাকরণে। দুই দল প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবেন। প্রথম দলে রেটিনা-বিশেষজ্ঞরা। দ্বিতীয় দলে বিজ্ঞান সংগঠকরা আর বিজ্ঞানীরা। মাঝখানে থাকবেন রেফারী / আম্পায়ার হিসাবে রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী। লাইন্সম্যান নিযুক্ত হননি কেউ। বেতার বা দূরদর্শনে ধারাবিবরনীও থাকছে না। দেখা যাক কি হয়! এ দিকে চশমা, বিক্রির রমরমা চলছে। জাল চশমা

তাও। দেখতে পেলে রাজার শান্তিরক্ষাবাহিনীর লোকরা গিরিপ্তারও করছে।

সিঙ্গাপুরে বসবাসকারি চীনাদের প্রতিশ্রুতি ড্রাগন যখন সূর্যকে গিলতে আসবে, তাঁরা পচা ডিম ছুড়ে মারবেন তাকে, টিনের ক্যানেস্তারা বাজিয়ে ঘাবড়ে দেবেন। থাইল্যান্ডের জ্যোতীষিরা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন বন্যা হবে, ভূমিকম্প হবে। শান্তিযজ্ঞ করতে অর্থ চেয়েছেন তাঁরা সরকারের কাছে। সরকার রাজী হচ্ছেন না। উল্টে প্রচার করছেন বিশ্ববাসীর কাছে তাঁদের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ দেখতে। বিপুল পরিমাণে বিদেশী অর্থ উপার্জন হবে এটা সে দেশের সরকারের তুমুল আশা।

ব্যাঙ্গালোরের জ্যোতীষি শ্রীভেঙ্কট-রমন বলেছেন—দিল্লীর আকাশে গ্রহণের সময়ে তুলা রাশি থাকবে 19° উপরে। ফলে উদীয়মান শুক্র গ্রহের উপরে, চাঁদ ও সূর্যের উপরে রাহুর প্রভাব পড়বে। ফল সাম্প্রদায়িক হানাহানি, ধর্মীয় উত্তেজনা, রাজনৈতিক উত্থান পতন। বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীনরসিমহাইয়া প্রতিবাদ করেছেন। জ্যোতীষি ঠাকুরকে বিতর্কের আসরে আহ্বান করেছেন। গ্রহণের দিন তিনি প্রচুর বিজ্ঞানী ও লোক-শিল্পীদের নিমন্ত্রণ করেছেন ব্যাঙ্গালোর ন্যাশনাল কলেজ প্রাঙ্গনের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে প্রাতরাশ খেতে খেতে গ্রহণের দৃশ্য উপভোগ করতে। পূর্ণ গ্রহণ উপলক্ষ্যে পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রেও মা লক্ষ্মী বেশ মুখ তুলে চেয়েছেন। ডায়মন্ডহারবার, আগ্রা, ভরতপুর, জয়পুর, বারানসী সবখানে একই ছবি। ফতেপুর সিক্রিতে একার জন্য ঘর—প্রতি রাতে 2500 টাকা। দুজনের—3500 টাকা!

স্থানীয় আবহাওয়ার খবর? অংশত মেঘলা। সরকারি খবর হচ্ছে—গত 24 বছরে মোট 12 বার মেঘলা ছিল 24শে অক্টোবরের দিনটি। এই বারে কি হবে?

22. 10. 95 : আজ রবিবার। আগামী পরশু সেই ঐতিহাসিক দিন। গতকাল রেডিও বলেছে গ্রহণ দেখা চলবে। রাজ্য সরকার অনুমতি দিয়েছেন। তবে উপযুক্ত সতর্কতা নিয়ে। কাগজে আরো বিশদ খবর পড়লাম। তবে খেলার মাঠ নয়, বিচার কক্ষের রূপ নিয়েছিল রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘরখানি। একদিকে রেটিনা-বিশেষজ্ঞদের বাহিনী। সংগে তাঁদের শাস্ত্রীয় বই—মানে চিকিৎসা-শাস্ত্রীয় বই। এই বিষয়ের জার্নাল। নথিপত্র। হ্যাঁ, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংগঠকদের দলও বেশ ভারি। 22 জন। তাঁদের হাতেও নথিপত্র। সন্ধ্যায় বৈঠকে বসার আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী দফায় দফায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে গিয়ে পরামর্শ করে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে আর বিজ্ঞানী-বিজ্ঞান সংগঠকদের চাপে একটু নরম হয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁকে নাকি দেখাচ্ছিল বিচারকের মত। তবে বিচারকের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে। তিনি নাকি রেটিনা-বিশেষজ্ঞদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। যাই হোক, সব ভাল যার শেষ ভাল। তবুও একটু ক্ষোভ থেকে গেল স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মনে। 6 কোটি মানুষ রাজ্যে। চশমা বিক্রি হয়েছে নাকি 3·50 লক্ষ মাত্র। বাকি লোকেদের কি হবে? না হয় 3 কোটি লোক গ্রহণ দেখবেন না। কিন্তু আরো 3 কোটি লোক? চশমা সাড়ে তিন লক্ষ মাত্র! গ্রামে গঞ্জে এই চশমা ঠিকমত পৌঁছবে? 5/6 সেকেন্ড মাত্র দেখতে হবে এক নাগাড়ে, চশমা দিয়েও। যাদের ঘড়ি নেই তাদের কি হবে? এ নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তিনি।

23. 10. 95 : আজ সোমবার। সকালে উঠে আকাশবাণী ও খবরের কাগজ থেকে আবহাওয়ার যা পূর্বাভাষ জানলাম, তা আদৌ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। রাতের আকাশ প্রধানত পরিস্কার থাকবে। আমাদের এ অঞ্চলে থাকবে গাঢ় কুয়াশার আস্তরণ, কিন্তু দিনের আকাশ? গত 24 ঘন্টায় বৃষ্টিও হয়েছে। অবশ্য কমই। 0·3 মিমি মাত্র।

দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র কোলকাতার সৌরভ সূর্য গ্রহণ দেখতে ডায়মন্ড-হারবার আসতে চেয়েছিল। বাবার অনুমতি মেলে নি। চোখের ক্ষতি হতে পারে এই ছিল তার বাবার আশংকা। সৌরভ কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। দোষ কার? সৌরভের? তার বাবার? না অন্য কোনো খানে?

অনেকে ভয়ে চশমা বিক্রি করে দিচ্ছেন। মানুষ দিশাহারা। এক-দিকে চশমা নিয়ে বিতর্ক। তার উপরে আকাশ।

আমাদের এখানে গাববেড়িয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পর্যবেক্ষণ শিবির হচ্ছে। স্থানীয় ছটি সংগঠন মিলে। তবে খুব বেশি প্রচার নেই। দঃ চব্বিশ পরগণার অনেক জায়গাতে গ্রহণ দেখার ব্যবস্থা হচ্ছে। সেসব জায়গায় বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান সংগঠনের সদস্যরা আসছেন দলে দলে। সাধারণ মানুষও। আমরা অন্য কোথাও যাবো না। আমাদের এই পর্য্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকেই এই ঐতি-হাসিক দৃশ্য দেখবো। "ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া।"

বিকালে বাড়িতে বসে বিগত কয়েক দিনের কাগজ পড়লাম। আর পড়লাম Nightfall on a Sunny Morning, ছোট পুস্তিকা। Confederation of Indian Astronomers এটি প্রকাশ করেছেন। সুদৃশ্য এবং নানাবিধ তথ্যে ঠাসা। ইংরেজি এই বই ছাড়াও বাংলাতে এঁরা একটা বই প্রকাশ করেছেন—"পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণ 1995" নামে। আর একটি ম্যাপ, দঃ চব্বিশ পরগণার উপর দিয়ে চাঁদের প্রচ্ছায়া যে পথ ছুঁয়ে যাবে তারই। অনেক কিছু জানতে পারলাম এগুলো পড়ে। সূর্যগ্রহণ দেখার অধিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মত আমাদের মত সাধারণ মানুষেরও আছে। কিন্তু চিন্তা আর যায় না আকাশ নিয়ে। আকাশ!

আজ গণশক্তি কাগজে শংকর চক্রবর্তীর লেখা পড়লাম। লিখছেন—"'গ্রাস' কথাটা ব্যবহারে আমার একটু আপত্তি আছে।.....আপত্তি এই কারণে যে 'গ্রাস' শব্দটির সঙ্গে রাহু ও কেতুর সূর্যকে গ্রাস করার প্রচলিত কুসংস্কার জড়িয়ে আছে। তাই প্রেক্ষাপটকে মনে রেখে পূর্ণ গ্রাসের জায়গায় পূর্ণ সূর্য গ্রহণ কথাটি ব্যবহার করলে সূর্য গ্রহণকে কেন্দ্র করে যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তি-বাদের যে লড়াই, সেই লড়াই শক্তিশালী হবে।" পড়ে ভালই লাগল। যুক্তিসিদ্ধ কথা। তাঁকে ধন্যবাদ।

420 বছর আগে আমাদের কোলকাতার কাছে পূর্ণ সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। তখন কোন আমল? মুঘল। আকবর দেহলীর মসনদে। 1575 খৃষ্টাব্দ। বাংলা সাহিত্যে তখন লেখা হয়ে গিয়েছে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত দু'বছর আগে। বাংলা সাহিত্যে তখন চলছে চৈতন্য যুগ।

তারও 41 বছর আগে শ্রীচৈতন্য-দেবের তিরোধান হয়েছে। হিন্দী কবি তুলসীদাসের বয়স হয়েছে 43 বছর। আরও লক্ষণীয় এই যে এই 1575/76 থেকেই বাঙ্গলাতে মোগল অধিকার কায়েম হয়। পাঠানের পর মোগল। তারও আগে—অনেক আগে—স্বাধীন ছিল বাঙ্গলা। সেই হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতা কি আজো ফিরে পেয়েছি আমরা? যাক সে সব কথা।

রাত্রে শুয়ে ঘুম আসছে না। এ বছরে বাজি পটকার আওয়াজ যেন একটু কম। ভাল। অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাজি পোড়ানোর ধোঁয়াতে যদি ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয় ব্যাঘাত ঘটবে গ্রহণ দেখায়। দরজা খুলে বাইরে এলাম। মাথার উপরে ঝকঝকে আকাশ। হাজার হাজার তারা ফুটে আছে। পূর্বদিকের আকাশে কালপুরুষ উঠেছে। উঠছে লুব্ধক। উত্তর পূর্বে দেখা যাচ্ছে ক্যাসিওপিয়া। ঐ তো ছায়াপথ। পেগাসাসন ও এ্যান্ড্রোমিডা হেলে পড়েছে। পশ্চিম আকাশে। আরও নিচে শনি। যে দিকে চাই তারা আর তারা। কোথাও মেঘ নেই একটুকরো। যাক আর ভয় নেই। কুয়াসা নেই। ধোঁয়াশা নেই। মেঘ নেই। মন প্রশান্ত হয়ে গেল। নিশ্চিন্তে এবারে ঘুমানো যাক। গ্রহণ দেখতে পাবো তাহলে?

24. 10. 95ঃ আজ সেই ঐতি-হাসিক দিন। গত রাত্রে ঘুম হয়নি। উত্তেজনা। বিশাল এক নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে চলেছি, তাই। বিছানা ছেড়ে এসেছিলাম বাইরে। দেওয়ালির অমাবস্যার রাত শেষ হয়ে আসছিল। ভোর 4টে বেজে 10 মিনিট। মাথার উপরে মনোরম আকাশ। ক্যাসিওপিয়া এসে দাঁড়িয়েছে উত্তর-পশ্চিম আকাশে। উত্তর-পূর্ব দিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল। সাত ঋষি যেন অভয় দিচ্ছেন—আশা পূর্ণ হবে। পাবে তোমরা গ্রহণ দেখতে। উজ্জ্বল হেসে সমর্থন জানাচ্ছে লুব্ধক। মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল নিশাচর পাখী একটা। বাঁশ বাগানের মাথায় তখনো বেশ অন্ধকার।

আজ তো সূর্যোদয় হবে 5·40 নাগাদ। এখনো 1 ঘন্টা 30 মিনিট। দিবাকর রাজু অমিত বাচ্চু ? তারা সব কি এখনো ঘুমুচ্ছে ? আর একটু পরে ওদের ডাকা যাবে। বরং পর্যবেক্ষণ শিবিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক। সৌর চশমাটা নিলাম। সাদা ধুতি ? আয়না ? সব ঠিক আছে। ছোট ভাই সন্তু আর বোন মিলি ওদের এবার ডাকা যাক। এমন সময় দিবাকর ইত্যাদি চতুর্মুখ এসে পড়ল হৈ হৈ করে। বাবা বললেন—"চা-টা খেয়ে যা।" মা চা তৈরী করলেন। মুড়ি ও চা খেলাম সকলে। মা ব্যাগে পুরে দিলেন—এক প্যাকেট বিস্কুট। বললেন—"গ্রহণ শুরু হলে তবে খাবি।" আমাদের সাতজনের মিনি মিছিল যাত্রা শুরু করলো। ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে। এখন ছটা বেজে দশ। হেমন্তের সূর্য তো বেশ হাসিখুশি বলেই মনে হচ্ছে। মামাবাবু হয়তো জানেন না—কি ঝামেলার দিন আজ তাঁর! ক্ষণিকের জন্য হলেও তাঁর আয়তনের তুলনায় নগন্য চাঁদ তাকে ঢেকে ফেলবে। মিলি হঠাৎ বলে উঠল "দাদা কটায় শুরু হচ্ছে রে ?" সন্তু যথোচিত গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল "7টা 32 মি 14 সেকেন্ড নাগাদ।" ওর পান্ডিত্য দেখে আমরা হেসে উঠলাম। সন্তু রেগে বলে উঠলো—"হাসলে কেন তোমরা ? বলতো এখানে পূর্ণ গ্রহণ শুরু বা দ্বিতীয় স্পর্শ কখন ?" রাজু বললো—"আমি জানি। 8টা 49 মি 10 সে।"

দেখতে দেখতে এসে গেলাম। এই তো গাববেড়িয়া বালিকা বিদ্যালয়। এখন সকাল 7টা। প্রচুর মানুষ। নানা বয়সের নানা সংগঠনের ফেস্টুন। পোস্টার টাঙানো হচ্ছে দেওয়ালের গায়ে। ওদিকে একটা ছোট টেলি-স্কোপ বসানো হচ্ছে। সাইকেল ভ্যানে কি আনছে ওটা ? টেলিভিশন। রঙীন। তাহলে টেলিভিশনও থাকছে! মাইকে কি বাজছে ? গণবিজ্ঞানের গান। "বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণ মন্ত্র!" ও দিকে কি হচ্ছে ? পিচ বোর্ডের মাঝখানে ছোট্ট ফুটো করে নিচ্ছে কারা সব ? বুঝেছি পর্দায় ফেলে সূর্যের গ্রহণ দেখানো হবে।

লোক আসছে কত! এমন কি শিশুকোলে মায়েরাও। বৃদ্ধ মানুষ আসছেন নাতির হাত ধরে। ছাত্রছাত্রীর তো শেষ নেই। হ্যাঁ, গ্রামের বৃদ্ধাও দেখছি কয়েকজন। বেশ ভালই তো। সবাই মিলে দেখার আনন্দের স্বাদ আলাদা। "আচ্ছা রাজু", আমি বললাম—"এই ফুটফুটে ছেলেটা কে রে।" রাজু বললে—"জানো না, ও তো কোলকাতা থেকে এসেছে। ওর বাবাও এসেছেন। মাও এসেছেন। গাববেড়িয়ার পল্লব বললে—সব কোলকাতার "গণদর্পণ" পত্রিকার তরফ থেকে এসেছেন। প্রায় 20 জন। সাথে 75 বছরের বৃদ্ধাও আছেন। আমরা অবাক হলাম। পল্লব বললে—"ওঁরা সব গতকাল সন্ধ্যাতে এসে গেছেন। অনেকে এসেছেন "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" পত্রিকা থেকে। রাতে ওঁরা মেয়েদের এই স্কুলেই ছিলেন। সব মিলিয়ে প্রায় পঁচাত্তর জন। খাওয়া-থাকার সাদামাটা ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ওঁরা সকলে তাতেই বেজায় খুশী।" শুনে আমারও ভাল লাগল। মিলি এসে হাত ধরে আমাকে টানতে লাগল। তাকে একটু অপেক্ষা করতে বললাম। পল্লব বলে চলেছে—"ওঁরা রাত্রে একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান করেছেন রে। গণবিজ্ঞানের গান আর গণযাদু ছিল। বেশ ভালই লাগছিল।" মিলি বললে—"বড়দা, ধুতিটা ওরা এক জায়গাতে টাঙিয়ে দিয়েছে। কেমন হয়েছে দেখবে চলো। ওতেই তো ছায়া লহরী দেখতে হবে।" মিলির আগ্রহ দেখে ভাল লাগলো। মাঠের এক কোণে সন্তুরা সাদা ধুতিটা টাঙিয়ে ফেলেছে। কালো কাগজে মোড়া আয়না দিয়ে সূর্যের ছায়া ফেলছে। আধুলির মত ছিদ্র রয়েছে আয়নার মাঝামাঝি কালো কাগজে। সেখান থেকে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে সাদা কাপড়ে। নাঃ এখনও দেরী আছে। চল্—ওরা সব পোষ্টার প্রদর্শনী করছে, দেখে আসি। দিবাকর রইলো ধুতিটার পাহারায়। আমরা সব পোষ্টার দেখতে চললাম। ইস, ইতিমধ্যে আরও কত নানুষ এসে গেছেন!

15/20 খানা পোষ্টার। সূর্য গ্রহণ কেমন করে হয় বেশ সুন্দর করে আঁকা। মুক্তামালা, হীরার আংটি, করোনা ইত্যাদির বড় বড় ছবি। পূর্ণ গ্রহণের সময়ের আকাশে যে সব গ্রহ-নক্ষত্র দেখা যেতে পারে তার ছবি। "ইস, কি মজা!" রাজু লাফিয়ে

উঠলো। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে মাইকে ঘোষণা হলো—"এখন 7টা 25, সবাই প্রস্তুত হতে থাকুন। আর প্রায় 7 মিনিট পরেই শুরু হবে প্রথম স্পর্শ।" আমাদের টাঙানো ধুতির কাছে ফিরে গেলাম। মাইকে বলছে "আমাদের এই পর্যবেক্ষণ শিবিরে সূর্যের পূর্ণ গ্রহণের ধারা বিবরণী দেবেন বন্ধু পীযূষ দাসগুপ্ত। তাঁর সহযোগিতায় থাকবেন দিলীপ বৈদ্য। দূরদর্শনের পর্দাতেও সূর্য গ্রহণের ধারা বিবরণী প্রচার করা হচ্ছে। আপনারা তাও দেখতে পারেন। তবে সাবধান, খালি চোখে কেউ আংশিক গ্রহণ দেখবেন না। চশমা ব্যবহার করুন। তাও এক ন্যাগাড়ে 5/6 সেকেন্ডের বেশী নয়। পিচ বোর্ডের পিন হোল ক্যামেরা আর টেলিস্কোপের ব্যবস্থা আছে।" হঠাৎ বিশাল চীৎকার উঠল—লেগেছে লেগেছে। তাই তো! এখন 7টা 33 মি। চশমা লাগিয়ে দেখলাম মামাকে। নাঃ, এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ! সূর্যের উপর দিকটা মানে পশ্চিম দিকটা একটু ছায়া ঢাকা। মাঠে লোক বোঝাই। টি. ভি. চলছে। সেখানেও অনেক। প্রায় সকলের হাতে চশমা। কেউ বা নিজের চশমা অপরকে দিচ্ছেন এক ঝলক দেখে নেবার জন্য। আয়োজক সংস্থাও 18 খানা সৌর চশমার ব্যবস্থা রেখেছিলেন যাঁদের চশমা নেই তাঁদের জন্য। সবাই বেশ হাসিখুশি। আমরা আমাদের সাধারণ আয়নার প্রতিফলনে আর চশমায় গ্রহণ দেখছি। এখন বাজে 8টা 18 মি। সূর্যের অনেকটা ঢাকা পড়েছে। রোদ্দুর একটু একটু করে কমছে। হেমন্তের এই সকালে যেন শীত শীত!

ও হ্যাঁ, তাপমাত্রা তো কমে যাবার কথা। আমি ধুতি পাহারায় রইলাম। ওরা সব একটু দূরদর্শন দেখতে গেল। এখানে আবার নকল চশমা বিক্রি করতে এসেছে? তাকে ধরেছে। স্বেচ্ছাসেবকরা। চশমা আটকে রেখেছে। গ্রহণ শেষে ফেরৎ দেবে। ওদিকে বিরাট খেলনা তৈরী করেছে। দুই ভাঁজ পিচবোর্ডে বিরাট এক বৃত্তাকার ছিদ্র। আর একটা পিচ-বোর্ডে বৃত্তাকার কালো সূর্য আঁকা। সমান মাপের। আকাশে সূর্যগ্রহনের অবস্থা দেখে ঠিক সেই মত খেলনাটিতে সূর্যগ্রহণের অবস্থা দেখাচ্ছে। এ্যাঁ চা? বেশ বেশ। ভাঁড়ে চা দিচ্ছে। সাথে বিস্কুট। ধন্যবাদ। কোনরকম দ্বিধা না করে সবাই দেখলাম চা খাচ্ছেন। আমাদের ব্যাগে মা বিস্কুট দিয়েছেন। বের করে আমরা খেলাম। অনেক বিস্কুট। অন্যদেরও দিলাম। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে গেছে অনেক। এখন 8টা 40 মিঃ। সূর্য যেন বাঁকা চাঁদ। তৃতীয়ার চাঁদ। কত মানুষ ছুটছে বট গাছের নিচে। ওখানে আবার কি? চল তো সব দেখি। গিয়ে তো অবাক। পাতার ফাঁক দিয়ে যেখানে রোদ্দুর এসে পড়ার কথা—সেখানে সব রক্তিম সূর্যের ছায়া। এক দুই তিন দশ পঞ্চাশ—কত আর গুনবো? দেখ মিলি, গাছের তলায় সাদা জামা পরা ছেলেটার গায়ে কত সূর্যের ছায়া! পীযূষবাবু ছবি ভুললেন কয়েকটা। দিবাকর বললে—দেখ দেখ পাখীরা কেমন পশ্চিমদিকে উড়ে বাসাতে ফিরছে! চেয়ে দেখি এক ঝাঁক টিয়া। পুকুরের হাঁস জল থেকে উঠে বাড়িতে ঢুকলো। গরু বাঁধা ছিল। সে বাড়ি যাবার জন্য হাঁকডাক শুরু করলো। বাবলা গাছের পাতাগুলি ঘুম দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। 8টা 44 মি। সূর্য কত ছোট হয়ে গেছে। যেন দ্বিতীয়ার চাঁদ। দিগন্তের পরিধি থেকে অন্ধকার ক্রমশঃ ক্রমশঃ সূর্যের দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ দিনমনিকে কেমন অসহায় মনে হচ্ছে।

মাইকে পীযূষবাবুর কন্ঠস্বর—"সবাই প্রস্তুত থাকুন। পূর্ণ গ্রহণ আসন্ন। আর কয়েক মিনিট। কিন্তু তার আগে তাকিয়ে থাকুন পশ্চিম দিকে চাঁদের প্রচ্ছায়ার ভীমবেগে ছুটে আসাটা চাক্ষুষ করতে পারেন কি না দেখুন। তবে নিচু থেকে দেখা সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমাদের পশ্চিমে কোন উন্মুক্ত দিগন্ত নেই। উঁচু ছাদ, গাছ বা পাহাড়ের মাথা থেকে ভাল বোঝা যায়।" সত্যিই আমরা স্কুলের মাঠ থেকে চাঁদের প্রচ্ছায়ার ওই প্রচন্ড দৌড়টা দেখতে পেলাম না। তবে স্কুল বাড়ির দোতলার ছাদে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এই দুর্লভ দৃশ্য দেখেছেন বলে দাবী করেছেন।

তবে যা দেখলাম, তাও বা কম কিসে? টাঙানো ধুতির উপর কিল-বিল করে গেল কি সব? সাপের মত! মাইকে পীযূষবাবু বলে যাচ্ছেন দ্রুত

লয়ে—''ছায়ালহরী চলে যাচ্ছে। দেখুন সাদা কাপড়ের পর্দায়, সাদা দেওয়ালের গায়ে, আপনার দেহ স্পর্শ করে চলে যাচ্ছে।" অনেকে এটা বুঝতেই পারলেন না। এত দ্রুত ঘটে যাচ্ছে সব।

পূর্ণ গ্রহণের শুরু বা দ্বিতীয় স্পর্শ হতে আর দেরী নেই। বট গাছের তলা থেকে সেই বঙ্কিম সূর্যরা কোথায় গেল? একটাও নেই। দম-বন্ধ করা উৎকণ্ঠা। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হলো। চীৎকার উঠল—"মুক্তামালা মুক্তামালা।" মাইকে দিলীপবাবুর হুঁশিয়ারি—চশমা খোলার সময় হয়নি কিন্তু।"

পূর্ণ গ্রহণ শুরু হতে আর দশ বারো সে. মাত্র বাকি। চাঁদের পূর্ব প্রান্তে আলোর রেখা। রেখাটা বড় হচ্ছে ক্রমশঃ। চাঁদের পরিধির বাইরে সেই রেখা। কালো চাঁদকে ঘিরে ফেলেছে। মাঝে মাঝে সেই রেখার উপরে উজ্জ্বল সব আলোক বিন্দু। মুক্তোর মত। কেন এমন হয়? সেমিনারে অমলেন্দু বাবু বলেছিলেন—"চাঁদের উপত্যকা অংশের ফাঁকা স্থান দিয়ে সূর্যের আলোর ঝলক বাইরে চলে আসে। চাঁদের গতির জন্য এই আলোর ঝলক গুলি দিক পরিবর্তন করতে থাকে। আর তখন মনে হয় যেন চাঁদের কালো দেহের চারপাশে দুলছে মুক্তার মালা একটা।" সুদূর 1715 সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেলী এটা লক্ষ্য করে-ছিলেন। পরে 1836 সালে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানী বেইলি এর কারণ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর নাম অঙ্কিত হয়েছে এই 'মুক্তার মালা'তে। নয়নাভিরাম মালার জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী। ভাল করে দেখার সময় পেলাম না। কটি মুক্তার সমাহারে এই মালা গাঁথা হয়েছে তাও পারলাম না বুঝতে।

পূর্ণ গ্রহণ শুরু হবে আরো 5/6 সে. পরে। মুক্তার দল প্রস্থান করেছে। কিন্তু মালার সেই সুতো রয়েছে তখনও। কপোলি আভাতে উদ্ভাসিত হয়েছে। আর একটা মাত্র আলোর ঝলক! যেন হীরার প্রভা নিয়ে উপস্থিত। সেমিনারে বলেছিলেন অমলেন্দুবাবু কারণটা। "চাঁদের দেহ সূর্যের আলোক মন্ডলকে আবৃত করে দিলেও চাঁদের অপেক্ষাকৃত নিচু একটি উপত্যকার ফাঁক দিয়ে একটা আলোর ঝলক বাইরে বেরিয়ে আসে।" এটাই উপস্থিত হয়েছে হীরার মহিমা নিয়ে। তবে হীরার আংটি ঝলসে উঠেই নিভে গেল। ভাল করে দেখাই হলো না। মহাকাশের কান্ডকারখানা দেখে সবাই যেন বাকরুদ্ধ। সূর্যের আলোক মন্ডল তখন কৃষ্ণচন্দ্রের দেহের আড়ালে চলে গেল, চকিতের জন্য দেখা গেল সূর্যের বর্ণমন্ডলকে। লাল আভার এই বর্ণমন্ডলের বর্ণালির ঝলক কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না। পারলাম না ওই বর্ণমন্ডলের সাম্রাজ্যে কোন সৌধ শিখার সন্ধান করতে। কত দ্রুত চলে গেল মুক্তামালা, হীরার আংটি আর বর্ণ-মন্ডলের শোভাযাত্রা। বিস্ময় আর বিস্ময়। ইতিমধ্যে মাইকে দিলীপ বাবু নির্দেশ এলো ভেসে—"এবার চশমা খুলে ফেলুন আপনারা—খালি চোখে উপভোগ করুন পূর্ণ সূর্য গ্রহণের অপার সৌন্দর্য।" সত্যিই কত বিস্ময় অপেক্ষা করছিল! বর্ণমন্ডলের লাল আভা নিরুদ্দেশ। সমবেত সবাই খালি চোখে এবার। একটা গর্জন উঠল জনতার মধ্য থেকে। দেখতে পাচ্ছি এক ফুল। ডালিয়া যেন। কালো চাঁদের বৃত্তটাকে ঘিরে পাপড়ি। পাপড়ি বারাবর অবশ্য অসমান মাপের। দ্বিগুণ দক্ষিণে চাপা। পূর্ব পশ্চিমে বর্ধিত। পাপড়ির রং? নীলাভ সাদা বলে মনে হচ্ছে আমার। চূর্ণ মুক্তা দিয়ে যেন নির্মিত এই করোনা। একে বলে সূর্যের ছটামন্ডল। কেউ বা বলেন সৌর মুকুট বা সৌর কিরীট। সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্রে এখন শান্ত অবস্থা চলছে। তাই করোনার এত বাড়-বাড়ন্ত। আয়নায়িত মৌল দিয়ে গঠিত এই করোনা। আর আয়নায়িত মৌল রয়েছে পদার্থের চতুর্থ অবস্থায় মানে প্লাজমা অবস্থায়। যাই হোক, করোনাকে প্রথম দর্শনে কেউ চীৎকার করে উঠেছিলেন। কেউ বা আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলেন। কেউ বা নির্বাক হয়ে পড়েছিলেন। তারপর সুগভীর নিস্তব্ধতা। অপার বিস্ময়ে দেখছে সবাই মহাকাশের এই অসীম গৌরবের আলোর রোশনাই। সূর্যের নিচে মানে পূর্ব দিকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের চির পরিচিত সেই শুকতারা, শুক্রগ্রহকে। বুধ কোথায় গেল? পেলাম না দেখতে। স্বাতীকেও পেলাম না। আর চিত্রা? বোধ হয় ঢাকা পড়েছে করোনার বিশালতায়।

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে" এখন! না, অন্ধকার কেন? আলো। মায়াবী এক আলো। সে আলো কি গোধূলির? না তো! তাহলে জ্যোৎস্নার? না। তাও নয়। সে আলোর বর্ণনা আমার সাধ্যের অতীত।

পূর্ণ গ্রহণ শেষ হবার বা তৃতীয় স্পর্শের আগে চোখে চশমা লাগিয়ে নেবার কথা কিন্তু প্রায় সবাই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। তৃতীয় স্পর্শের পর বিপুল বিক্রমে আত্মপ্রকাশ করলে দ্বিতীয় পর্যায়ের হীরার আংটি। চোখ ঝলসে দিয়ে গেল যেন। নিষেধ ছিল খালি চোখে দেখার। কিন্তু ধর্মের কাহিনী শুনলাম কই। কি হবে? চিন্তায় পড়লাম। আবার ভাবলাম কি আর হবে! সেদিন তো কাগজে পড়েছি—"This (Diamond Ring) Celestial phenomenon can be seen with the naked eye and can be photographed without any solar filter"—(The Telegraph 16.10.95). যাই হোক দ্বিতীয় পর্যায়ে মুক্তামালা আর দেখা গেল না। অন্ততঃ আমি দেখতে পাই নি। সূর্য আপন মহিমায় ফিরে আসতে শুরু করলো। চতুর্থ স্পর্শ বা গ্রহণ শেষ হলো। ঘড়িতে তখন 10টা বেজে 18 মি.। নাটকের ক্লাইম্যাক্স বা চরম মুহূর্তের পর অনেক দর্শক যেমন নীরবে ঘরে ফেরেন, এখানেও যেন তাই হ'ল। হঠাৎই যেন সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেলেন এবং বাড়ী-মুখো রওনা দিলেন—মাঠটা প্রায় ফাঁকা হয়ে এল। শেষ পর্যন্ত ছিলেন অবশ্য অনেকে। বাড়ী ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম—আর কোনদিন কি এ দৃশ্য পাব দেখতে? পথ চেয়ে থাকি। "আমার এই পথ 'চাওয়াতেই' আনন্দ"!

23.12.95 ঃ পূর্ণ গ্রহণের সূর্যকে দেখেছি প্রায় 2 মাস আগে। এ নিয়ে আর ডায়রিতে কিছু লিখতে পারিনি। একটি খবর পড়েই আজ আবার বসেছি। কিন্তু সেটা বলার আগে আরও দু একটা কথা বলে নিই।

1. মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবন্ধ রথযাত্রার কথা। লোকারণ্য। মহা ধুমধাম। ভক্তরা সব প্রণাম করছেন লুটিয়ে পড়ে। রথ ভাবছে আমি দেব পথও তাই। মূর্তিও তাই। আর অন্তর্যামী হাসছেন। কুসংস্কার ও ভীতি প্রদর্শনকে উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ মানুষ পূর্ণ গ্রহণের দুর্লভ নিসর্গ শোভা উপভোগ করেছেন—বিজ্ঞান-মনস্ক হয়েছেন। এর কৃতিত্ব কার? কোন বিজ্ঞান-সংগঠনের? মিডিয়া-গুলির? মন্ত্রীর? না বিজ্ঞানীর?

2. সৌর চশমায় যাঁরা পূর্ণ সূর্য গ্রহণ দেখেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বি. বা. দী. বাগের রক্তিম বাড়িটা থেকে নিদান হাঁকা হয়েছে "বুঝবে পাঁচ বছর পর, এখন কি!" মন্ত্রীমহোদয় ভয় নিশ্চয়ই দেখান নি! পাঁচ বছর ধরে নিশ্চয়ই তিনি কোনোভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন-সত্যিই সূর্য গ্রহণ দেখে চোখের ক্ষতি হয় কিনা বা কখন কতটা হয়—পাঁচ বছর পর্যন্ত। ভবিষ্যতের কোন মন্ত্রীকে আর ডাক্তার-বিজ্ঞানীর বিতর্কসভা বসাতে হবে না! তিনি বা তাঁরা কিছু নির্দিষ্ট তথ্য পেয়ে যাবেন।

3. এই বার বলি প্রথমের শেষ কথাটি। আজই কাগজে পড়লাম। গতকাল শুক্রবার রাত্রে প্রথম পৃথিবীকে দেখেছেন যাঁরা তাঁদের এক-জনের মা শ্রীমতী কেয়া গাঙ্গুলী। বাবা প্রবীর কুমার গাঙ্গুলী। এই শিশু যখন মাতৃজঠরে, তখন মা ডায়মন্ডহারবারে হুগলী নদীর তীরে এক বাড়ির ছাদে বসে পূর্ণ সূর্য গ্রহণ দেখেছেন। শত শত বর্ষের লালিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শ্রীমতি গাঙ্গুলীর এই বিদ্রোহ তাঁর সন্তান ও আমাদের সকলের পাথেয় হবে, প্রত্যাশা রাখি।

□ বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত

গ্রহণ চশমা নিয়ে বিতর্ক ঃ এক নজরে ঘটনাপ্রবাহ

জুলাই 7 1995

উদয়পুরের সোলার অবজার-ভেটরির অধিকর্তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি দেন। খালি চোখে যেন কেউ গ্রহণ না দেখেন এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারির অনুরোধ জানিয়ে এই চিঠি। এ ব্যাপারে চক্ষু বিশেষজ্ঞদের সাথেও আলোচনা করতে বলেন।

জুলাই 10 1995

রাজ্যের অপথালমোলজি ইনস্টি-টিউটের অধিকর্তা এক বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় গ্রহণ দেখা ঠিক হবে না। চোখে সোলার-ফিল্টার লাগিয়েও না।

আগষ্ট 4 1995

দিল্লীর নির্মাণ ভবনে এক বৈঠক হয়। সভাপতিত্ব করেন চক্ষু বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এক উপদেষ্টা। বৈঠকে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধিকর্তা সোলার-ফিল্টার চোখে লাগিয়ে গ্রহণ দেখার পক্ষে রায় দেন। চক্ষু বিশেষজ্ঞরা এর বিরোধিতা করেন। তাদের বক্তব্য দেশের বেশীর ভাগ লোকই অজ্ঞ এবং নিরক্ষর। তারা সঠিকভাবে সোলার-ফিল্টার ব্যবহার করতে পারবেন না।

অক্টোবর 18 1995

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আগস্ট মাসের বৈঠকের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের নজরে আসে অক্টোবর মাসের আঠারো তারিখে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তড়িঘড়ি বৈঠক ডাকা হয় পরের দিনই।

অক্টোবর 19 1995

আটজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ নিয়ে বৈঠক করেন স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সিদ্ধান্ত হয় খালি চোখে অথবা সোলার-চশমা পড়ে কোনভাবেই গ্রহণ দেখা উচিত হবে না। বেশীর ভাগ চশমা উপযুক্ত মানের নয়। সেজন্যই এই সিদ্ধান্ত।

অক্টোবর 20 1995

সব খবরের কাগজে বড় বড় হরফে এই সংবাদ প্রচারিত হয়। প্রচন্ড বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংস্থা থেকে এতদিন ধরে প্রচার চালানো হয়েছে বিরল এই দৃশ্য দেখার জন্য। দেখানোর জন্য তারা নানান উদ্যোগ নিয়েছেন। গ্রহণ চশমা বিক্রি হয়েছে হাজার হাজার। গ্রহণের মাত্র চারদিন আগে রাজ্য সরকারের তরফে এমন ঘোষণায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন অনেকে। আর্জি জানান এই সিদ্ধান্ত বাতিল করার। এবং এমন অভিযোগও অনেকে করেন যে আসলে মানুষের ঘরে ঘরে চশমা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব এড়াতে সরকার এই পথ নিয়েছে।

অক্টোবর 21 1995

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাধ্য হন ফের বৈঠক ডাকতে। এবার আলোচনায় যোগ দেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছাড়াও কিছু বিজ্ঞান-অধ্যাপক এবং বিজ্ঞান ক্লাব সংগঠনের প্রতিনিধি। তুমুল বাক-বিতন্ডার মধ্যে আলোচনা শেষ হয়। চক্ষু বিশেষজ্ঞরা তাদের পূর্বের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তাঁরা বলেন গ্রহণ দেখা ঠিক হবে না। অন্যদিকে অধ্যাপক ও বিজ্ঞান সংস্থার লোকজন নথিপত্র দেখিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন উপযুক্ত সাবধানতা নিয়ে গ্রহণ দেখলে ক্ষতি নেই। অবশেষে স্বাস্থ্য-মন্ত্রী প্রায় হাল ছেড়ে দেন। ঘোষণা করেন—দেখুন গ্রহণ। তবে যথাযথ মানের সোলার ফিল্টারের মধ্য দিয়ে।

প্রশ্ন ওঠে—কে এর মান ঠিক করবে? স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরক্তিভরা

উত্তর—আমার জানা নেই। জিজ্ঞাসা করুন বিজ্ঞানীদের। তবে যদি কেউ অন্ধ হন তো দায়িত্ব ওদেরই। গ্রহণ দেখার কি দরকার বুঝি না—এমন মন্তব্যও নাকি করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

অক্টোবর 24 1995

বিপুল উৎসাহে লোকজন সূর্য গ্রহণ দেখেছেন। সাধ্যমত সাবধানতা নিয়েই।

সংক্ষিপ্ত মন্তব্য

জনগণ এসব বাকবিতন্ডায় কান দিয়েছেন বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানী প্রশাসক, মন্ত্রী, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত লোকেদের বেহাল অবস্থা দেখে মজা পেয়েছেন নিশ্চয়ই মানুষ। তবে গ্রহণ দেখবেন কি দেখবেন না সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ীই। যার প্রমাণ একদিন আগে থেকে ডায়মন্ডহারবারে গ্রহণ দর্শনার্থী মানুষের ভীড়ে প্রশাসনের বেহাল অবস্থা।

☐ 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'কে টিক সময়ে উপযুক্ত বিষয়বস্তু সহ প্রকাশিত হতে সাহায্য করুন।

☐ লেখা পাঠান—'উন্নয়ণ'কে ঘিরে বিতর্ক বা পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রচনা—গণস্বাস্থ্য বা নিউক্লিয়ার শক্তি সব কিছুই বি ও বি সাদরে গ্রহণ করবে। বিশেষ অনুরোধ—স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক রিপোর্ট, অনুসন্ধান বা সমীক্ষার জন্য বি ও বি-তে নিয়মিত বিভাগ রাখা হচ্ছে। এই বিভাগে লেখা পাঠান।

☐ গ্রাহক হোন, কাছের মানুষদের গ্রাহক হতে সাহায্য করুন। একটি ছোট্ট উদ্যোগকে বাঁচিয়ে রাখতে আপনার সহযোগিতা খুবই জরুরী।

☐ বি ও বি পাওয়া যাচ্ছে—বি বা দি বাগ—টেলিফোন ভবনের উল্টোদিকের কয়েকটি স্টল। উৎস মানুষ, বুক মার্ক ও রাসবিহারী—আশুতোষ মুখার্জী রোড জংশন, ডেকার্স লেন (দিলীপ মজুমদারের স্টল)।

গ্রহণ চশমার ভালমন্দ

সূর্যগ্রহণ দেখা ঠিক হবে কিনা এই নিয়ে বিতর্ক প্রতিবারই হয়। এবারেও হয়েছে। তবে অন্য কারণে। কুসংস্কার ঘিরে নয়। কথা উঠেছিল গ্রহণ দেখলে চোখের ক্ষতি হবে। এমন কি গ্রহণ দেখার জন্য তৈরী চশমা চোখে লাগিয়ে দেখলেও। এই আশঙ্কা মাথায় রেখেই বহুলোক সূর্য গ্রহণ দেখেছেন এবার। স্বভাবতঃই বিভ্রান্তি থেকেই গেছে। তাই কি ধরণের ক্ষতি এবং তার সম্ভাবনা কতটুকু সে সম্পর্কে এই প্রতিবেদন।

সূর্যের আলো নানান বস্তু থেকে ঠিকরে এসে আমাদের চোখে পড়ে। আমরা দেখি। এটাই জানি। আসলে সূর্য থেকে যত ধরণের রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে তার অতি সামান্য এক অংশই আমাদের দেখার অনুভূতি জাগায়। বাদ বাকির অস্তিত্ব টের পাইনা। অন্তত চোখ দিয়ে। এজন্য অন্য ব্যবস্থা দরকার। বিভিন্ন ধরণের রশ্মি চেনানো হয় তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ দিয়ে। প্রায় 400 থেকে 750 ন্যানোমিটার (nm) এই তরঙ্গ দৈর্ঘ জুড়ে রশ্মিকে দৃশ্য-আলোক বলে। বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘের আলোক রশ্মি আমাদের চোখে পড়ে বিভিন্ন ধরণের রঙের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এর বাইরের অর্থাৎ এর থেকে কম এবং বেশী তরঙ্গদৈর্ঘের দু'ধরণের রশ্মির কথা সূর্যগ্রহণ প্রসঙ্গে উঠেছে—আলট্রা-ভায়োলেট বা ইউ. ভি. (Ultra-violet বা uv) রশ্মি এবং ইনফ্রা-রেড বা আই. আর. (Infrared বা ir) রশ্মি। 400-এর নীচে প্রায় 200 ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ অবধি রশ্মিকে ইউ. ভি. এবং ওপর দিকে 750 থেকে অনেকখানি জুড়ে আই. আর. রশ্মি হিসেবে ধরা হয়।

এই দু'ধরণের রশ্মিই কম বেশী আমাদের চোখের ক্ষতি করতে পারে। ইউ. ভি-এর মধ্যে 280 থেকে 320 ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘের রশ্মি বিশেষ-ভাবে চোখের পক্ষে ক্ষতিকারক। আমাদের চারপাশের প্রায় সব বস্তুই এইসব রশ্মি শোষণ করে। কম আর বেশী। ইউ. ভি. রশ্মি জলের মধ্য দিয়ে বেশী দূরে এগুতে পারে না। দ্রুত শোষিত হয়। তাই চোখে পরলে কর্নিয়াতেই বেশীর ভাগ শোষিত হয়। রশ্মি জোরালো হলে কর্নিয়ায় প্রদাহের সৃষ্টি হয়। বলা হয় কেরাটাইটিস হয়েছে। মোটামুটি 288 ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘের রশ্মিতেই এর সম্ভাবনা বেশী। আর 320 ন্যানো-মিটারের কাছাকাছিতে কনজাংক্টি-ভাইটিস এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুক্ষেত্রেই চোখ দিয়ে জল গড়ায় এবং চোখে যন্ত্রনা হয়। তবে দিন কয়েকের মধ্যে এমনিতেই সেরে যায় চোখের এই অসুস্থতা। যদি না খুব সাংঘাতিক রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয় চোখ।

অন্যদিকে আই. আর.-এর দিকের 1500 ন্যানোমিটার পর্যন্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘের রশ্মি চোখের মধ্যে অনেকখানি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কর্নিয়া পেরিয়ে আইরিসে ও লেন্সের মধ্য দিয়ে পেছনের রেটিনাতেও পৌঁছয়। ফলে খুব জোরালো রশ্মি হলে তা কর্নিয়া থেকে শুরু করে রেটিনা অবধি চোখের যেকোন অংশের ক্ষতি করতে পারে। বিশেষ করে রেটিনার স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। 1500 ন্যানো-মিটার তরঙ্গদৈর্ঘের ওপরে আই, আর, রশ্মি অবশ্য এত ভেতরে প্রবেশ করার আগেই শোষিত হয়। ফলে এর জন্য ক্ষতি কর্নিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রশ্ন উঠতে পারে আমরা তো সর্বক্ষণ এই ধরণের রশ্মির মধ্যেই আছি। তা সূর্যের থেকে হোক বা কোন কৃত্রিম উৎস থেকে আসা রশ্মি

হোক। তাহলে বিশেষ করে গ্রহণের সময় এই প্রসঙ্গ উঠছে কেন ?

কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া কৃত্রিম আলোর উৎসগুলি খুব জোরালো হয়না। যেখানে হয় সেখানে সাবধান হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। যেমন পথে ঘাটে অনেকেই খেয়াল করেছেন ওয়েল্ডিং-এর কাজের সময় চোখের সামনে একটা গার্ড রাখা হয়। লেজার রশ্মি নিয়ে কাজ করেন যারা তাদেরকেও সাবধান থাকতে বলা হয়। তেমনি সূর্যের বেলাতেও বলা হয়। এমনি সময় কে আর সূর্যের দিকে তাকাতে যাচ্ছে ? আর তাকানো যায়ও না। কিন্তু গ্রহণের সময় অন্য কথা। তখন কষ্ট হলেও ওদিকে তাকিয়ে থাকার প্রবণতা স্বাভাবিক। তাতেই ক্ষতি হতে পারে। আসলে সময়ের ব্যাপারটাই গুরুত্বপূর্ণ। মুহূর্তের জন্য তাকালে হয়তো কিছু নাও হতে পারে। স্বাভাবিক সহনসীমার একটা আছে আমাদের। তার ওপরে হলেই বিপদ। যেমন মোটা দাগের একটা হিসেব হল প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার স্থানে যদি 0·03 জুল (J) পরিমান শক্তি আপতিত হয় তাহলে প্রদাহ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

তাহলে সাবধানতা অবলম্বনের ব্যাপারটা দু'দিক দিয়ে দেখতে হবে। এক, আলো একটা নির্দিষ্ট মাত্রার নীচে কমিয়ে আনতে হবে। দুই, দৃশ্য আলোর বাইরের রশ্মিও যাতে চোখে ঢুকে না পড়ে দেখতে হবে। পড়লেও তার মাত্রা যেন সহনসীমা ছাড়িয়ে না যায়।

গ্রহণের আগে বাজারে নানা ধরণের চশমা পাওয়া যাচ্ছিল। প্রশ্ন উঠেছিল এদের গুণাগুণ নিয়ে। অর্থাৎ এই দুটো দিক সুরক্ষিত কিনা এই ভাবনায়। ব্যাপারটা যাচাই করে দেখার জন্য বিওবি'র তরফ থেকে কয়েকটি নমুনা চশমা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। তিনটি নমুনা নেওয়া হয়েছিল। পুরণো এক্সপোজ্‌ড এক্স-রে ফিল্মের কালো অংশ দিয়ে তৈরী চশমা। এলুমিনিয়াম-কোটেড মাইলার ফয়েল এবং নিকেলক্রোমিয়াম ইনকোনেল কোটেড কাঁচের প্লেটের চশমা। এজন্য স্পেক্‌ট্রোফটোমিটার যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে ওই তিন ধরণের চশমাই মোটামুটি একই রকম। মোটামুটি 0.3 শতাংশ আলো এদের মধ্যে দিয়ে গলে আসছে। আর স্পেক্‌ট্রাল-কোয়ালিটি অর্থাৎ দৃশ্য আলোর বাইরের রশ্মি প্রতিরোধের কাজটাও মোটামুটি করছে। যদিও খানিকটা করে ইউ ভি এবং আই আর রশ্মি এদের মধ্য দিয়ে গলতে দেখা গেছে। তবে তার মাত্রা খুব বেশী নয়। তবে এই তিন ধরণের চশমার মধ্যে এক্স-রে ফিল্মের চশমাই তুলনামূলকভাবে ভাল। এক্স-রে ফিল্মের সাথে তুলনা করে দেখা গেছে মাইলারের ক্ষেত্রে 900 ন্যানোমিটার এবং ইনকোনেল-কোটেড কাঁচের প্লেটের ক্ষেত্রে 1100 ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আই আর রশ্মি খানিকটা করে লিক করছে। তবে পরিমাণে কম। আমাদের সংগৃহীত তিনটি চশমাই নিরাপদে ব্যবহারযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

আসলে ধাতুর কোটিং দেওয়া মাইলার বা কাঁচের প্লেট এখানে ফিল্টারের মত ব্যবহার করা হলেও এ দুটোই প্রকৃতপক্ষে আয়নার মত কাজ করেছে। বেশীর ভাগ রশ্মি এতে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে গেছে। খানিকটা শোষিত হয়েছে। এবং খুব অল্পই চশমা গলে চোখে এসে পড়েছে। যেহেতু ধাতুর কোটিং নিশ্ছিদ্র ভাবে করা দুরূহ তাই কিছু আলো লিক করতেই পারে। তাই এই আয়না যারা ডবল-ফেরতা করে লাগিয়ে চশমা করেছেন তারা সম্পূর্ণ নিরাপদে গ্রহণ দেখেছেন ধরে নেওয়া যায়।

□ র. চ.

---

* পরীক্ষায় সাহায্য করেছেন অমিতাভ বসুরায়, সমীর সরকার এবং অজয় ঘোষ।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ ঠিকানা বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল

[1995-এর চব্বিশে নভেম্বর গিরিশ মঞ্চে একটি ছোট্ট সুন্দর লোকগান ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান হয়ে গেল ইন্দোজাপান স্টিলস শ্রমজীবী হাসপাতালের সংহতিতে। এটির আয়োজক ছিল বরাহনগর বিজ্ঞান বিকাশ ও অন্যবাক গোষ্ঠী।

শ্রমজীবী মানুষদের উদ্যোগে "আমাদের স্বাস্থ্য আমরা গড়ব" এ লক্ষে গড়ে ওঠা হাসপাতাল পশ্চিমবঙ্গে সম্ভবত এটিই প্রথম। এই প্রসঙ্গে দলহী রাজহারার শ্রমিকদের তৈরী "শহীদ হাসপাতালের" কথা হয়তো আপনাদের মনে পড়বে।

ঐ অনুষ্ঠানের দিনেই সন্ধ্যায় ও আরো কয়েকদিন প্রতিবেদক গিয়েছিলেন ঐ হাসপাতালটি দেখতে, জানতে, বুঝতে। প্রতিবেদনটি তারই ফলশ্রুতি।—সঃ মঃ]

ব্রহ্মদেব বর্মার টি. বি. হয়েছিল। গরীব ছাত্র। পয়সা নেই। তাই চিকিৎসার জন্য তিনি শ্রমজীবী হাসপাতালে আসেন। প্রতিদিন ইনজেকশান নিতে হত। একদিন সনৎদা বললেন, তোমাকে কিন্তু এখানে কাজ করতে হবে। সেই ১৯৯০'র জুলাই থেকে এখানে। 'এখন অবশ্য আমি রোগী নই। ওয়ার্ড মাস্টার। ইনজেকশন নেওয়া, মেডিসিন দেওয়া, অপারেশন থিয়েটার মেনটেন করা ইত্যাদি অনেক কাজ, ডাক্তারবাবু না থাকলে আমাকে করতে হয়।'

সেন্টজনস অ্যাম্বুলেন্স থেকে প্রশিক্ষণ নিতে আসা শুভ্রা সি'র কথা ধরা যাক। বাবা বিধুভূষণ সি একজন কারখানার শ্রমিক। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছয়। অভাবী। শুভ্রা ভাবছেন, পয়সা কম পেলেও এঁরা যদি তাকে এখানে কাজ করতে নেয় সে করবে। কারণ···

ভদ্রেশ্বর থাকেন শিবাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্ভ্রান্ত ঘরের মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা। স্পাইনাল কর্ডের সমস্যা থেকে ক্রমশ বেড সোর ইত্যাদি। কোলকাতার ভালো-ভালো হাসপাতাল ছেড়ে কেন যে এরকম একটি হাসপাতালে উঠেছেন। সে প্রশ্নের উত্তরে, মৃদু হেসে বললেন, 'ভালো ডাক্তার এই আন্তরিকতা, ভালোবাসা অন্য কোথাও তো পাবো না বাবা? আমি তো বেড়াতে এসেছি, বাড়ির লোকেদের সঙ্গে।'

ইন্দো-জাপান স্টিলস লিমিটেড-এর শ্রমিক মহেন্দ্র মাহাতো (43) কারখানার ডিউটির বাইরে এক ফাঁকে হাসপাতালে ঢুকে পড়েন। পেশেন্ট দেখা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, যেকোন কাজ আনন্দের সঙ্গে করেন। যদিও এসব কাজ তাঁর নয়। আনন্দ! তাঁর ছেলে সতীশও হাসপাতালের কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করেন। এরজন্য তাঁরা দু'বেলা হাসপাতাল থেকে খাওয়া পান। যাঁরা স্টাফ, অতিরিক্ত গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি বাবদ 400-500 টাকা পান। একজন নার্স আছেন সর্বক্ষণের জন্য। তিনিও সামান্য কিছু অতিরিক্ত টাকা পান।

15ই ডিসেম্বর থেকে এখানে অর্থোপেডিক, গাইনেকোলজি, জেনারেল সার্জারি—সমস্ত রকম আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা শুরু হয়েছে। ডাক্তার আছেন, ডঃ কল্যাণ বিশ্বাস, ডঃ পল্লব দাস, ডঃ জি. কর, ডঃ প্রকাশ সাবৈক, ডঃ মালবিকা বিশ্বাস। সন্ধ্যে ৬টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত

এমার্জেন্সী কেস নেওয়া হয়। কেবলমাত্র মেডিকেল এর ক্ষেত্রে। অপারেশন হলে আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়। এবছর এ পর্যন্ত 412টি অপারেশন হয়েছে। শ্রমিকরা নিজেরাই ডাক্তারদের পরামর্শ মত অপারেশন থিয়েটারের অনেক সরঞ্জাম তৈরী করে নিয়েছেন। এবছর এক সহৃদয় ব্যক্তি 20টি বেড দান করেছেন। অনেকে তাঁদের অব্যবহৃত ঔষুধ দিয়ে যান। স্থানীয় জনসাধারণ সবসময় নানাভাবে হাসপাতালকে সহযোগিতা করেছেন।

এই যে এত সব। হঠাৎ হাসপাতালই বা কেন? 1977 সাল। গান্ধীর জন্মদিন। ইন্দো-জাপান স্টিলস লিমিটেড লকআউট হয়। খোলে পরের বছর মে মাসে। তখন শ্রমিকরা অনুভব করেন সময়ে অসময়ে স্থানীয় মানুষের সহায়তা বিশেষভাবে জরুরী। এইসময় খামার পাড়ায় এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের সূত্রপাত। কেননা এখানকার লোকেরা খুব গরীব। স্বাস্থ্য সমস্যাও প্রবল।

1983 সালে কিছু উদ্যমশীল ডাক্তার, স্বেচ্ছাকর্মী ও শ্রমিকদের একাংশ মিলে বেলুড় শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্পের কাজ শুরু করেন ঐ খামার পাড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি ঘরে। 1984 সালে জুনিয়র ডক্টরদের আন্দোলনের সময় কিছু আদর্শবাদী ডাক্তার মিলে তৈরী করেছিলেন পিপ্‌লস হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন বা পি. এইচ. এস. এ নিম্কো ইউনিয়নের ঘরে। বেলুড়ের ইন্দোজাপান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন দীর্ঘসংগ্রামের পর কিছু ডাক্তার ও স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় একটি চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তুলতে সক্ষম হন। উদ্দেশ্য নর্মান বেথুনের আদর্শকে সামনে রেখে শ্রমিকদের সাথে স্থানীয় মানুষেরও চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার ব্যবস্থা করা। প্রাথমিকভাবে এখানে বহির্বিভাগ চালু করা হয়। 11 বছর পর 1994 সালের পয়লা মার্চ এটি হাসপাতালে রূপান্তরিত হল ইন্দো-জাপানেরই সহযোগী প্রতিষ্ঠান জি. এস. ডব্লিউ-র পরিত্যক্ত অফিস বাড়ীতে। বাড়ীটি ভাঙাচোড়া অবস্থায় বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল বহুদিন। শ্রমিকরাই সারিয়ে ব্যবহার উপযোগী করে তোলেন। এখন ঐ দোতলা বাড়ীটিতেই হাসপাতাল চলছে। 4 শয্যার সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর বেডের সংখ্যা 10টি। 5টি মহিলাদের আর 5টি পুরুষদের জন্য। প্রয়োজনে আরও দুতিনটি বেড বাড়ানো সম্ভব। এই বাড়ির সংস্কার, বেড ট্রলি, অপারেশন টেবিল ইত্যাদি বহু জিনিসই শ্রমিকরা নিজেরাই তৈরী করেছেন। বাকী জিনিসপত্র কেনা হয়েছে। একটি অপারেশন থিয়াটর, X-ray মেসিন, সাধারণ প্যাথোলোজিকাল টেস্টের ব্যবস্থা আছে।

শুধু শ্রমিকরা নন, যে কেউই এখানে চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারেন। অন্যান্য যেকোন বেসরকারী হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের তুলনায় এখানকার খরচ খুবই কম। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বড় রকমের হার্নিয়া অপারেশন (7 দিন থাকা সহ) এর খরচ 975 টাকা। খাবার ও ওষুধপত্র বাড়ী থেকে ব্যবস্থা করতে হবে। বন্ধ কলকারখানার শ্রমিক ও দরিদ্র মানুষের জন্য খরচ আরও কমে যাবে। সাধারণ আউটডোরে দেখাতে কোন ফি লাগে না। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে লাগে 11 টাকা, রক্তের সাধারণ পরীক্ষা 7 টাকা, ই. সি. জি 21 টাকা। মেডিসিন, সার্জারি, অর্থোপেডিক্স, পোডিয়াট্রিক্স ও গাইনোকলজি—এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা আছেন। আছেন সর্বক্ষণের জন্য একজন ডাক্তার, কম্পাউন্ডার ও নার্সরা। হাসপাতাল সম্প্রসারণের কথা ভাবা হচ্ছে। তিন তলার সংস্কার করে ইনডোর বেডের সংখ্যা 24টি করার কথা হচ্ছে। কাজ শুরুও হয়েছে—চলছে পুরোদমে। নূতন কিছু ডিপার্টমেন্ট খোলার কথা হচ্ছে—যেমন নিয়মিত প্রসূতি বিভাগ, অকুপেশনাল ডিজিজ ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদি।

কানোরিয়া শ্রমিকরা যখন নিজস্ব উদ্যোগে শ্রমজীবী মানুষদের একটি হাসপাতাল গড়ার কথা ভাবছে, তখন বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল (পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত একমাত্র হাসপাতাল) বেশ ভালোভাবে চলছে। যদিও কোম্পানীর মালিক পক্ষ এই কিছুদিন আগেও হাসপাতালটি উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছিল। □

বিষয় ঃ পরিবেশ (দ্বিতীয় পর্ব)

দুই

দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার উর্দ্ধে পরিবেশ কোন বিমূর্ত বিষয় নয়। মানুষের সৃষ্টি-স্থিতি-কৃতি সবই পরিবেশ নির্ভর। লয়ও বোধহয় পরিবেশ ধ্বংসে। সমাজ-সংস্কৃতি-জীবিকা সবকিছুই আজ পরিবেশ দূষণের প্রচ্ছায়া-উপচ্ছায়া কবলিত। বিজ্ঞান-কারিগরী পরিবেশ দূষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। দূষণ রোধেও বিজ্ঞান-কারিগরীকেই হাতিয়ার হয়ে উঠতে হবে ঠিকই, কিন্তু পরিবেশমুখী একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে তা সম্ভব হবে না বলেই মনে হয়। এমনই এক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসন্ধানের উদ্যোগ—বিষয় ঃ পরিবেশ।

যে কেউ এ বিভাগে প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। কমবেশী দশ হাজার শব্দের মধ্যে লেখা পাঠান। চিঠিপত্রে মতামত জানান। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর খবর, টীকা, সমীক্ষাও গৃহীত হবে। —সঃ মঃ

দূষণের মাপ ও মাত্রা ঃ দ্বিতীয় অংশ (বায়ু দূষণ)

আকাশের বাতাস আঁচল
জীবনে এসেছে দোল ;
লুকোচুরি খেলে ঘাসে
শিহরে গাছের পাতা
সবুজের মাথায় নাচে।

সাগরের নোনতা বুকে
ছোঁ মেরে আঁজলা ভরে
মিঠে জল আনে বাতাস,
বলা সে সূর্য-তেজে
প্রাণিত প্রাণের আকাশ।

আজও তো বাতাস বিনা
জীবনের নাও চলে না ;
ধোঁয়াশার ধা ঘি তেটে
বুকেতে বসছে সেঁটে,
উঁচিয়ে বিষের ছোবল
পেছনে আসছে ধেয়ে ;
আপামর মন্দ মেয়ে
সকলে হৃদ্দ কেশে।
বাতাস-ই সর্বনেশে
বাতাসী লোভের দেশে।

ডঃ কলিতা এসেছিলেন শীতের কলকাতায়, দিন পনেরোর একটি কাজ নিয়ে। তিন চারদিনের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, সর্দি কাশি, মাথা ধরা। ডাক্তার দেখলেন, ওষুধ খেলেন কিন্তু কমার কোন লক্ষণ নেই। কাজ অসমাপ্ত রেখেই তিনি ফিরে গেলেন শিলং-এ। তিন চার দিন পরে চিঠি এল ফেরার পরই ম্যাজিকের মত তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন। ডাক্তারের অভিমত ডঃ কলিতারও—কলকাতার বায়ুদূষণই তাঁর অসুস্থতার কারণ।

রিটায়ার করার পর সারাজীবনের সঞ্চয় উজাড় করে ঘোষমশায় একটি ছোট্ট বাড়ী করেছেন—কলকাতার

কাছেই শহরতলীতে। প্রাথমিক আনন্দ আর প্রশান্তি উঠে গেল মাস ছয়েকের মধ্যেই। তিনি নিজে তো অসুস্থ হয়েছেনই, বাড়ীর সকলেই কমবেশী অসুস্থ। অনতিদূরের মাঝারি একটি কারখানা থেকে কি যে গ্যাস ছাড়ে প্রায়ই, বাতাস ভারী হয়ে যায়। শীতে আর বর্ষায় চোখ-মুখ জ্বালা করা একটা ঝাঁঝালো গ্যাস যেন বুকের উপর চেপে বসে! ঘোলাটে একটা ধোঁয়াশা আচ্ছন্ন করে থাকে চারদিক। মাথা ঝিমঝিম করে, বমি, পায়, খাওয়ার অরুচি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা। প্রতিকারহীন অশক্ত নিরুপায় ঘোষবাবু বাড়ীর সকলের ধিক্কার সয়ে দিন গোনেন মৃত্যুর।

বছর পঁচিশের যুবক রোশেনারা শীতের আতঙ্কে দিশেহারা। গত তিন চার বছর শীতকালের তিনচার মাস ধরে সে অসম্ভব কষ্ট পাচ্ছে। ভোররাতে কাশির দমকে ঘুম ভাঙে। অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় শ্বাস-কষ্ট। ঘন্টা দুই তিন একটানা কাশি আর শ্বাসকষ্ট চলার পর বেগ স্তিমিত হয়ে আসে। ডাক্তারের ওষুধে প্রথম প্রথম কাজ হতো, ক্রমেই জোরালো ওষুধ বেশী বেশী মাত্রায় দিতে হচ্ছে ফল পাবার জন্য। খরচও চলে গেছে নাগালের বাইরে। ডাক্তার বলেছেন শহরের বাইরে মুক্ত তাজা বাতাসের জায়গায় গিয়ে থাকতে। কিন্তু রোশেনারা নিরুপায়।

* * *

এমনি বিভীষিকাময় দিন কাটছে বহু মানুষের। নগরের শহরের। শিল্প শহরের বা তার কাছাকাছি গ্রামেরও। সবাই বায়ুদূষণের শিকার। কোন দুর্ঘটনা নেই, নেই হঠাৎ ছড়িয়ে পড়া বিষগ্যাস, ভূপালের মত, তবু এঁরা সকলেই জানেন বায়ুদূষণই তাঁদের অসুস্থতার কারণ। জানেন না কী এর প্রতিকার। এক অমোঘ ভবিতব্য বলেই মেনে নেন সকলে।

বস্তুত জলদূষণের ক্ষেত্রে তবু যেন মনে হয় কিছু করা সম্ভব, করা হবে। কিন্তু বায়ুদূষণের প্রকরণগুলি অদৃশ্য অপ্রতিরোধ্য যেন।

আসুন, আমরা আগে একটু পরিচিত হয়ে নিই বায়ুদূষণের কি ও কেন'র সঙ্গে।

আমরা সকলেই জানি বাতাসের মূল উপাদান হল অক্সিজেন ও নাই-ট্রোজেন। এছাড়াও অন্যান্য কিছু গ্যাসীয় পদার্থ বাতাসে থাকে ঠিকই কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায় সেগুলি হয় ক্ষতিকারক নয়, অথবা ক্ষতি করার মত পরিমাণে থাকে না। মানুষ, অন্যান্য জীবজন্তু, গাছপালা-ফসল, বাড়ীঘর-স্তম্ভ-সৌধ ইত্যাদির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতি ডেকে আনতে পারে এমন কোন কিছু বাতাসে মিশে থাকলে তাকে বলা যায় বায়ুদূষণ। বায়ুদূষণ জনিত ক্ষতি তাৎক্ষণিকও হতে পারে আবার তিলতিল করে জমা দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিও হতে পারে। প্রাকৃতিক নানা কারণেও বায়ুদূষণ ঘটে ঠিকই (যেমন, ঘূর্ণিঝড়, ধূলিঝড় দাবানল, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, জৈব পদার্থের পচন ইত্যাদি) কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট বায়ুদূষণই আমাদের আলোচ্য। বায়ুদূষণ প্রধানত দুধরণের মনে করা যায়—কণাপদার্থ ও গ্যাসীয় পদার্থ।

1. **বাতাসে ভাসমান কণা-পদার্থ** তথা টোটাল পার্টিকুলেট ম্যাটার (Total Particulate Matter TPM): হবু রাজা / গবু মন্ত্রীর দেশে মাত্র সাড়ে সতেরো লক্ষ ঝাঁটায় সব ধুলো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে গিয়ে 'জগৎ···ধুলোয় ভরপুর' হয়ে গেছিল। সে দিক থেকে দেখতে গেলে এ পৃথিবীতে যে কত কোটি ঝাঁটা সক্রিয় তার সঠিক হিসেব পাওয়া মুস্কিল। যদিও তারা ধুলো দূর করার জন্য নয়, ধুলো নিয়ে নানা গুরুগম্ভীর কাজকর্মের সুবাদেই প্রতিদিন 'আকাশে' লক্ষ লক্ষ টন 'ধুলো' মিশিয়ে দিচ্ছি। খনির কাজ, পাথরের কাজ, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিমেন্ট কারখানা এবং অন্যান্য নানা ধরনের কলকারখানা থেকেই উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে কণাপদার্থ—কঠিন এবং তরলও। গোলাকৃতি ধরে নিয়ে বলা যায় এদের ব্যাস মোটামুটি এক মিটারের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ থেকে এক হাজার ভাগের এক ভাগ (0·01-1000 মাইক্রোমিটার।)

কী না থাকতে পারে বাতাসে ভাসমান এইসব কণাপদার্থে সাধারণ ধুলো-বালি, পাথর-গুঁড়ো, জ্বালানী-জাত কার্বণ-কণা, ওড়া ছাই (fly ash) এসব যে থাকতে পারে তা অনুমান সাপেক্ষ। কিন্তু এসব ছাড়াও কণাপদার্থের মধ্যে অবশ্যই থাকতে পারে অ্যাসবেস্টসের সূক্ষ্ম আঁশ,

বিষাক্ত বেরিলিয়াম ধাতুর যৌগ, সীসা, পারদ, তেজস্ক্রিয় ধাতু বা যৌগ। কণাপদার্থের মধ্যে অবশোষিত (adsorbed) থাকতে পারে কিছু গ্যাসীয় ও তরল পদার্থ।

সূক্ষ্মতর কণাপদার্থ অনেকভাবেই গ্যাসের মত আচরণ করে। এক জায়গায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে এরা বাতাসে ভর করে পাড়ি দেয় দূর দূরান্তরে, এমন কি গোটা পৃথিবী। অপেক্ষাকৃত হাল্কা পদার্থের ক্ষুদ্র একটি ধূলিকণা (ধরা যাক এক মিটারের লক্ষ ভাগের এক ভাগ ব্যাসবিশিষ্ট) উর্ধ্বাকাশ থেকে এক বছরে নামতে পারে মাত্র 30-50 মিটার। আর ইতিমধ্যে বাতাসের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে কণাটি পাড়ি দিতে পারে 30-50 হাজার কিলোমিটার।

বহু বিচিত্র উপাদান বিশিষ্ট বলে কণাপদার্থ মানুষ পশুপাখী-গাছপালা-বাড়ীঘর ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতিও করতে পারে বিচিত্র উপায়ে। মানুষের ক্ষেত্রে শ্বাসনালীর অসুখ, ফুসফুসের অসুখ, ক্যানসার, চর্মরোগ ইত্যাদি বিরল নয়।

বাতাসের কণাপদার্থ মাপার নানা যান্ত্রিক পদ্ধতি আছে। মোটামুটি বলা যায় একটি ছিদ্রপথে নির্দিষ্টহারে টেনে নেবার সময় বাইরের বাতাস যদি তার কণাপদার্থ একটি বিশেষ ফিল্টার কাগজে বা বিশেষভাবে নির্মিত অন্য কোন চাকতিতে জমা দিয়ে যায়, তবে সহজেই তা পরে ওজন করে নেওয়া যায় এবং প্রয়োজনে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে উপাদানও জানা যায়। এ ধরণের যন্ত্রগুলি হাই-ভলিউম স্যাম্পলার নামে পরিচিত। কারণ এরা একটানা ঘন্টা বা তারও বেশী পর্যন্ত চলে অনেকটা আয়তনের বাতাস থেকে কণাপদার্থ সংগ্রহ করতে পারে।

কণাপদার্থের পরিমাপের একক পি পি এম (ওজন হিসেবে প্রতি দশ লক্ষ ভাগ বাতাসে যত ভাগ কণা বর্তমান) হতেই পারে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক তাপ-চাপে একক আয়তনের বাতাসে কত ওজনের কণা আছে—সেটা জানা সুবিধাজনক। সাধারণত এই ওজন মাইক্রোগ্রামে (এক গ্রামের দশলক্ষ ভাগের একভাগ) বা মিলিগ্রামে প্রকাশ করা হয়। তাই দূষণ নির্দেশক এককটি দাঁড়ায় প্রতি ঘনমিটার বাতাসে কত মাইক্রোগ্রাম বা মিলিগ্রাম কণা আছে। (ug/m^3 বা mg/m^3)। অনেক সময় অবশ্য বাতাসের আয়তন যে স্বাভাবিক (Normal) তাপ-চাপে (25°c স্বাভাবিক বায়ুচাপ) তা বোঝাতে Nm^3 লেখা হয়। গ্যাসীয় বায়ুদূষকও ppm অথবা ug/Nm^3 বা mg/Nm^3 এককে প্রকাশ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে ppm বলতে বোঝানো হয় স্বাভাবিক তাপ (25·C) ও চাপে দশ লক্ষ ভাগ আয়তনের বাতাসে কত আয়তন গ্যাসীয় দূষক পদার্থ আছে। কণাপদার্থ ছাড়া বাতাসের দূষণে যে সব গ্যাসের ভূমিকা প্রধান তাদের কয়েকটি সম্পর্কে নীচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

2. সালফার অক্সাইড (SOx): এতে সাধারণত থাকে সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2); অল্প পরিমাণে সালফার ট্রাইঅক্সাইড (SO_3) থাকে বলে যুগ্মভাবে এদেরকে বলা হয় সক্স্ (SOx)। অন্যতম উৎস জ্বালানীর গন্ধক তথা সালফার। কয়েকটি চিহ্নিত শিল্প যেমন—শাল-ফিউরিক অ্যাসিড, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি থেকে SOx বেশী নির্গত হয় ঠিকই, তবে জ্বালানী ব্যবহারী যেকোন জায়গা থেকেই SOx আসতে পারে।

অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রার SOx-এর প্রভাবে দমবন্ধ হয়ে মারা যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম মাত্রাতে গলা জ্বালা, চোখ জ্বালা, শ্বাসকষ্ট সাধারণ ব্যাপার। দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবে শ্বাস যন্ত্রের নানাবিধ অসুখ দেখা দেয়। কোন কোন উদ্ভিদ-প্রজাতি SOx এর প্রভাবে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে কিছু কিছু শস্য-সব্জী-ফসল হয় সম্পূর্ণ নষ্ট হয় অথবা কম হারের উৎপাদন দেয়। তীব্র অ্যাসিডধর্মী বলে মার্বল জাতীয় পাথরে দ্রুত ক্ষয় আনে SOx। তাজমহলের ক্ষয়ের জন্য মথুরার তৈলশোধনাগারকে দায়ী করে মাঝে মাঝে হৈ চৈ শোনা গেছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালেরও ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে বলে ধরা পড়েছে।

সালফার ডাইঅক্সাইড বাতাসে দীর্ঘদিন স্থায়ীভাবে থাকে না। নানা ভাবে বিক্রিয়া করে হয় সালফার ট্রাই-অক্সাইডে পরিণত হয়, অথবা জলে দ্রবীভূত হয়ে বৃষ্টিতে ধুয়ে অ্যাসিড হিসেবে নেমে আসে। সালফার ট্রাই-অক্সাইডও সহজেই জলে দ্রবীভূত

হয়ে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। বাতাসে অ্যামোনিয়া পেলে এরা সালফেট লবণ তৈরী করে জলে দ্রবীভূত হয়। SOxই অ্যাসিড বৃষ্টির অন্যতম কারণ। সালফার ডাইঅক্সাইডের বাতাসে অর্ধজীবন প্রায় তিন দিন। অর্থাৎ তিন দিনে মাত্রা অর্ধেকে নেমে আসে. পরবর্তী তিন দিনে আরও অর্ধেকে এমনিভাবে চলে! বাতাসে ভাসমান ধূলিকণায় উপস্থিত কোন কোন ধাতু সালফার ডাই-অক্সাইডের ট্রাইঅক্সাইডে পরিণত হওয়ায় অনুঘটকের কাজ করে।

3. **হাইড্রোজেন সালফাইড** (H_2S) : সালফার ঘটিত দুর্গন্ধ যুক্ত এই গ্যাসটিও যথেষ্ট ক্ষতিকারক। রেয়ন কারখানা, পেট্রোলিয়াম শিল্প, রং শিল্প ইত্যাদি উৎস চিহ্নিত হলেও আরও নানাভাবে এটি বাতাসে মিশে যায়। এমনকি দূষিত জলের শোধন প্রক্রিয়াতেও এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। এটিও শ্বাসনালীর প্রবাহ সৃষ্টি করে। কোন কোন জীব প্রজাতি (যেমন ক্যানারি পাখি)—এই গ্যাস একদমই সহ্য করতে পারে না। মানুষের ক্ষেত্রে এটি শ্বাসনালীর প্রদাহ সৃষ্টি করে। খুব বেশী মাত্রায় (600 ppm) শুঁকলে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে মানুষ মারাও যেতে পারে।

বায়ুমন্ডলে হাইড্রোজেন সাল-ফাইডের অন্তিম পরিণতি SOx-এর মতই। কেননা বিচিত্র বিক্রিয়াপনে এটি SOxএই রূপান্তরিত হয়।

4. **নাইট্রোজেন অক্সাইড** (NOx) : এক্ষেত্রে একাধিক নাইট্রোজেন অক্সাইডের সম্মিলিত অভিধা নক্স্ (NOx)। এর মূল উপাদান নাই-ট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) এবং নাইট্রিক অক্সাইড (NO)।

SOx-এর মত NOx ও অ্যাসিড ধর্মী এবং অন্তিম পরিণতি জলে দ্রবী ভূত হয়ে অ্যাসিড বর্ষণ। কিছুটা নাইট্রেট লবণেও পরিবর্তিত হয়। শ্বাসনালীর প্রদাহ, ব্রংকাইটিস, ফুস-ফুসের রোগ (Pulmpoary Oede-ma) ইত্যাদির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা গেছে NOx-কে।

বাতাসের ধূলিকণার ধাতুর উপস্থিতিতে 4-5 দিনের মধ্যে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) ওজোন বা পারমানবিক অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাই-ট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) তৈরী করে। নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন, মোটরগাড়ীর নির্গত ধোঁয়া, বিস্ফোরক পদার্থের উৎপাদন—এগুলি NOx এর অন্যতম প্রধান উৎস।

5. **হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড** (HF) : এই অ্যাসিড গ্যাসের প্রধান উৎস হল—সার কারখানা (ফসফেট সার), অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাষণ শিল্প, ইস্পাত ও কাচশিল্প। তীব্র প্রদাহ সৃষ্টিকারী এই গ্যাস সহজেই জলে দ্রবীভূত হয় এবং ফ্লোরাইড লবণে পরিণত হয়। শ্বাসনালীর অসুখেও এর অবদান আছে। তবে ফ্লোরাইড যৌগের বিশেষ ভূমিকা হাড় ও দাঁতের ক্ষতিতে, শস্যহানিতে।

6. **কার্বন মনোক্সাইড** (CO) : তীব্র বিষাক্ত এই গ্যাস সাধারণত কার্বন যুক্ত জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহনে সৃষ্টি হয়। খনি, লোহা নিষ্কাষণের বাত চুল্লী (Blast Furnce) এবং মোটরগাড়ীর ধোঁয়াপথে এর উপস্থিতি খুবই স্বাভাবিক।

7. **হাইড্রোকার্বন** (Hydro-carbons) : নানারকম রাসায়নিক শিল্প এবং মোটরগাড়ীর ধোঁয়ায় হাই-ড্রোজেন ও কার্বনের বিভিন্ন গ্যাসীয় যৌগ থাকে যাদের সম্মিলিতভাবে হাইড্রোকার্বন বলা হয়। অপর্যাপ্ত অক্সিজেন জ্বালানী দহনের ফলেই এদের সৃষ্টি হয় এবং পরস্পর বিক্রিয়া করে আরও নতুন ধরণের হাইড্রো-কার্বনের জন্ম দেয়। ইথিলীন নামক হাইড্রোকার্বনটি তুলো এবং কয়েকপ্রকার আর্কডের বিশেষ ক্ষতির কারণ। বেনাজিন ঘটিত কিছু কিছু হাইড্রো-কার্বন ক্যানসার সৃষ্টিকারী বলে চিহ্নিত হয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বেঞ্জ-আলফা-পাইরিনের নাম (Benz-alpha-pyrene)। সম্মিলিতভাবে এদের বলা হয় পলিনিউক্লিয়ার অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন Polynuclear Aro-matic Hydrocarbons বা PAH)।

8. **ক্লোরোফ্লোরোকার্বন যৌগ বা সি এফ সি** (Chlorofluoro Carbons CFC) : ক্লোরিন ফ্লোরিন এবং কার্বনের কয়েকটি যৌগ-যাদের সাধারণ নাম—ক্লোরোফ্লোরোকার্বন যৌগ—পৃথিবী জুড়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে——বিশেষত, রেফ্রিজারেটারে, এয়ার-কন্ডিশনিং-এ এবং নানা ধরণের স্প্রে-তে। অত্যন্ত সুস্থির ও হালকা এই

গ্যাসীয় যৌগগুলি সহজেই পৃথিবীর বায়ুমন্ডল অতিক্রম করে উর্দ্ধাকাশে ওজোন স্তরে গিয়ে পড়তে পারে। সেখান সৌর-অতিবেগুনী রশ্মির দ্বারা এগুলিতে ভাঙন ধরে এবং ক্লোরিনের পরমাণু মুক্ত হয়। এই মুক্ত ক্লোরিন পরমাণু অত্যন্ত সক্রিয় এবং ওজোনের সঙ্গে শৃংখল বিক্রিয়ায় (Chain reactoin) ধ্বংস করে ওজোনকে। এর ফলে পৃথিবীর সুরক্ষার বর্ম ওজোন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে বলে ক্রমশ বেশী বেশী তথ্য প্রমাণ হাতে আসছে বিজ্ঞানীদের।

9. **ভিনাইল ক্লোরাইড** (Vinyl Chloride, C_2H_3Cl): পি ভি সি নামক প্লাস্টিকের উৎস হল ভিনাইল ক্লোরাইড। গ্যাসীয় ভিনাইল ক্লোরাইড মানুষের পক্ষে রীতিমত বিপজ্জনক। বস্তুত এটি ক্যানসার সৃষ্টিকারী। পৃথিবীর বহু দেশে তাই পি ভি সি উৎপাদন হয় নিষিদ্ধ নয়তো কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত।

10. **তেজস্ক্রিয় গ্যাস**: ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় ধাতুর খনিজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে তেজস্ক্রিয় রেডন (Rn) গ্যাস। আরও কয়েক প্রকার গ্যাসীয় তেজস্ক্রিয় যৌগ পারমানবিক ক্রিয়াকান্ডের ফলে (শান্তিপূর্ণ বিস্ফোরণ সহ) বাতাসে মিশে গিয়ে সাধারণ তথা পারিপার্শ্বিক তেজস্ক্রিয়তা (Background Radiation) ধীরে ধীরে বাড়াতে সাহায্য করছে। এলাকা বিশেষে বায়ুমন্ডলীয় বা পারিপার্শ্বিক তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা রীতিমত উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে ভারত সহ অন্যান্য বহু দেশে।

11. বাতাসের 'ধুলো-গ্যাস' বা মিলেমিশে সামগ্রিকভাবে জন্ম দেয় এক সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির যেন এক নতুন ল্যাবরেটারির। আর এই 'ল্যাবরেটারীতে' অবিরাম চলতে থাকে রাসায়নিক সংশ্লেষণ এবং বিয়োজন প্রক্রিয়াদি। এমন অনেক বিচিত্র পথে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে বায়ুমন্ডলে—যা মনুষ্যসৃষ্ট কোন ল্যাবরেটারীতে এতদিন করা যায় নি। এইসব বিক্রিয়ার হদিস সবেমাত্র পেতে শুরু হয়েছে বলা যায়।

বায়ুমন্ডলীয় এই 'ল্যাবরেটারীতে' যেমন বায়ুদূষকের ধ্বংস বা লয় প্রাপ্তি ঘটছে তেমনি আবার নতুন বায়ুদূষকের উদ্ভবও ঘটছে। এরকম কিছু পরোক্ষ বায়ুদূষক পরিচিতি লাভ করেছে **'আলোক রাসায়নিক জারক পদার্থ'** (Photochemical oxidants) নামে। ওজোন, পারঅক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রাইল (PAN), নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO_2) এবং বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন থেকে উৎপন্ন অনেকরকম অক্সিজেন যুক্ত হাইড্রোকার্বন এবং মুক্ত-মূলক (free radical) এই দলভুক্ত।

'আলোক রাসায়নিক' বিশেষণে ভূষিত করার কারণ এই যে এদের সৃষ্টির মূল বিক্রিয়াগুলি সূর্যালোক-প্রণোদিত।.....এমনিতে পৃথিবীর কাছের বায়ুমন্ডলে ওজোন গ্যাসের পরিমান প্রায় নগন্য (0.01-0.07 ppm)। কিন্তু শহরাঞ্চলে কোন কোন বিশেষ সময়ে (যেমন শীতকালে জমা স্মগ (Smog) বা ধোঁয়াশায়) ওজোনের মাত্রা 0.5 PPm. (স্বাভাবিকের দশগুণ) পর্যন্ত পাওয়া গেছে। NOx এবং হাইড্রোকার্বন যৌগ থেকে আলোক রাসায়নিক শৃংখল বিক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি যেমন ওজোন 'সংশ্লেষ' ঘটে, ঠিক তেমনি নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড থেকে আলোর সাহায্যে 'সংশ্লেষণ' ঘটে পারমানবিক অক্সিজেনের। এবং বায়ুমন্ডলীয় 'ল্যাবরেটারীতে,' সূর্যালোক, ওজোন, পরমাণু অক্সিজন, 'ধূলিকনা'র বিশেষ ধাতব উপাদান (এবং অবশ্যই বাতাসের আনবিক অক্সিজেন O_2) সকলে মিলে ঘটিয়ে চলে একের পর এক অজানা এবং 'অসম্ভব' সব রাসায়নিক বিক্রিয়া।

ওজোন গাছপালার পক্ষে অন্য যে কোন বায়ু দূষকের চেয়ে ক্ষতিকারক বলে মনে হচ্ছে। তামাক, পালং ইত্যাদি তো ওজোনের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। শুধুমাত্র SOx বা NOx-এর দরুণ যে ক্ষয়ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ওজোন সহযোগে তা অনেকগুণ বেড়ে যায়। রবার ও প্লাষ্টিককে কমজোরী ও ভঙ্গুর করতে ওস্তাদ ওজোন।

ধোঁয়াশাতে (Smog) আলোক রাসায়নিক জারক পদার্থগুলির মাত্রা বেশ বেশী থাকে বলে জানা গেছে (200 ug/m^3)। এবং মানুষের ক্ষেত্রে ফুসফুসের প্রদাহ সৃষ্টিতে এগুলি বিশেষ কার্যকরী। ক্যানসারের-উপাদানও বেশী মাত্রায় থাকার সম্ভাবনা

কারখানার ধোঁয়ায় অসুস্থ বহু, গ্যাস-লিক ভেবে ব্যাপক আতঙ্ক

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিভিন্ন কারখানার চিমনি থেকে নির্গত ধোঁয়া কুয়াশার সঙ্গে মাটির কাছাকাছি নেমে আসায় 'গ্যাস লিক' হয়েছে ভেবে বুধবার রাতে উত্তর চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কুয়াশার সঙ্গে মেশা ওই ধোঁয়ায় মানুষের চোখ জ্বলতে থাকে। অনবরত কাশি হতে থাকে। অসুস্থ হয়ে পড়েন বেশ কয়েকজন। কামারহাটি থেকে খড়দহ পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে গঙ্গার তীর বরাবর সব পাড়াতেই এই 'গ্যাস' ছড়িয়ে পড়ে। দমকল এবং পুলিশ ছোটাছুটি করেও গ্যাসের উৎস খুঁজে পায়নি। দমকলের এক অফিসার বলেন, "কোথা থেকে গ্যাস বেরোচ্ছে, তা ধরতে পারছি না। কারখানার চিমনির ধোঁয়া কুয়াশার উপরে উঠতে পারছে না। ওই ধোঁয়াশার জন্যই এই বিপত্তি। আমরা তো আর সব কারখানা বন্ধ করে দিতে পারি না। তবে, কোথাও কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাঁকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাব বলে এলাকার বাসিন্দাদের জানিয়ে দিয়েছি।" এর আগে, গত 12 নভেম্বর রাতে খড়দহে একইভাবেবিষাক্ত গ্যাস আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। সেই ক্ষেত্রেও গ্যাসের আসল উৎস খুঁজে পাওয়া যায়নি। এইদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় গভীর রাতেই শিশু ও বৃদ্ধদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়।

বি টি রোড থেকে গঙ্গা—খড়দহ, কামারহাটি, পানিহাটির এই অংশটায় বুধবার সন্ধ্যা থেকেই মানুষের অস্বস্তি শুরু হয়ে যায়। রাত যত বাড়তে থাকে, ততই অস্বস্তিটা অসুস্থতায় বদলে যেতে থাকে। রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যায়। লোকেরা জানালা-দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন ঘরে। রাস্তার উপরে সাদা ধোঁয়া। 10 ফুট দূরেও কিছু দেখা যায় না। আগরপাড়ার প্রগতি মাইতি বলেন, "ক্রমাগত কাশি হচ্ছে, রাস্তায় ধোঁয়া-কুয়াশার সঙ্গে মিশে গিয়েছে গ্যাস। মনে হয়, বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকেই গ্যাসটা বেরোচ্ছে। ঝাঁঝালো গন্ধ, ভয়ে দরজা, জানালা খুলতে পারা যাচ্ছে না।" আগরপাড়ার দুই কিলোমিটার দক্ষিণে কামারহাটির ঠাকুরদাস চ্যাটার্জি রোডের তুষার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "শ্বাস নিতেই ভয় লাগছে। গরমজলে কাপড় ডুবিয়ে তা নাকেমুখে ধরছি। কী হয়েছে, কিছু বুঝতে পারছি না। বাড়ির লোকেদের অন্যত্র সরিয়ে দেব কি না, সেটাও কেউ বলছে না।" খড়দহ থানার এক অফিসার বলেন, "বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানাটি সকালে বন্ধ ছিল। সন্ধ্যায় খুলেছে। চিমনির ধোঁয়া কুয়াশার সঙ্গে মিশেই এই বিপত্তি ঘটিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তার সঙ্গে অন্য কারখানার ধোঁয়াও আছে। আমাদের 'মোবাইল' ভ্যান গ্যাসের উৎস খুঁজে পায়নি। গঙ্গার ধারে কোনও পাইপ লাইনও নেই।" দমকলের ওই অফিসার বলেন, "এই অবস্থায় মানুষ কী করবে, সেই পরামর্শ আমরা দিতে পারি না। একটু হাওয়া থাকলে হয়ত ধোঁয়া সরে যেত। মানুষের কষ্ট লাঘব হত। হাওয়াও নেই।"

সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, 23 নভেম্বর, 1995

ধোঁয়াশায়। জলবায়ুর বিশেষ অবস্থায় ধোঁয়াশা কখনও কখনও ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকতে পারে।

একথা মনে রাখা ভালো যে বায়ু দূষক গ্যাস বা কণাপদার্থের তালিকা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা অবান্তর। যে কোন ধরণের শিল্প থেকেই যে কোন ধরণের রাসায়নিক পদার্থ বাতাসে মিশছে স্থানীয়ভাবে ক্ষয়ক্ষতিও করছে। যেমন অ্যামোনিয়া, বা ক্লোরিন গ্যাস-লিকের ঘটনায় প্রাণ হারানোও বিরল নয়। কিন্তু আমাদের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়নি। ঠিক তেমনি, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড (HCN)-কেও আমরা তালিকায় আনিনি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই বিষাক্ত গ্যাসটি মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে হাইড্রো-সায়ানিক অ্যাসিড, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি গ্যাস এবং আরও কিছু গ্যাসীয় সায়ানাইড যৌগ, নাইট্রেট এবং নাইট্রাইট যৌগ—এদের কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে রক্তের হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়ায়। এবং তার ফলে দেহের টিস্যু তথা কোষে অক্সি-জেনের ঘাটতি জনিত নানারকম শারীরিক লক্ষণ এবং যন্ত্রণা দেখা দিতে পারে, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে অথবা পৃথকভাবে দেখা দেয় রক্তাল্পতা। (ধূমপায়ীদের মধ্যে কোষের অক্সিজেন সরবরাহের ঘাটতির সমস্যা ক্রনিক আকার ধারণ করার সম্ভাবনা বেশী।) জলে ও জমিতে—সব্জী-ফসলে পর্যন্ত নাইট্রাইট-নাইট্রেট যৌগের অন্যতম প্রধান উৎস হ'ল বাতাসের NOx থেকে অ্যাসিড বৃষ্টি। এই নাইট্রাইট-নাইট্রেটও এক বিশেষ ধরণের রক্তের ক্ষয়ের কারণ বলে চিহ্নিত হয়েছে।

পরিমাপন

বাতাসের গ্যাসীয় দূষক পদার্থের উপস্থিতির মাত্রা পরিমাপ করার জন্য নানা যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদ্ধতি আছে। না সেগুলি সুলভ বা সহজলভ্য, না সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য। তবে গায়ে পরিমাপের দাগ কাটা এবং ভেতরে কঠিন বিক্রিয়ক পদার্থ দিয়ে প্যাক করা দুমুখ সিল করা একধরণের স্বচ্ছ কাচের টিউব বাজারে ছেড়েছে কিছু কিছু (বিদেশী) কোম্পানী। ড্রেগার (Drager) কোম্পানীর নামে এসব টিউবের পরিচিতি ঘটেছে ড্রেগার টিউব নামেই। সালফার ডাইঅক্সাইড, H_2S, CO, NO_2, হাইড্রোকার্বন ইত্যাদির জন্য পৃথক পৃথক টিউব পাওয়া যায়। এমনকি কমবেশী মাত্রার জন্য একই গ্যাসের একাধিক টিউবও আছে। ব্যবহারের সময় টিউবের দুমুখ ভেঙে নিয়ে নির্দিষ্ট আয়তন বাতাস টিউবের মধ্য দিয়ে পাম্প করে টেনে নিতে হয়। ভেতরের বিক্রিয়ক পদার্থ দূষক গ্যাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করে টিউবের ভেতরে ঠাসা বিক্রিয়কের রং পাল্টে দেয়। এক প্রান্ত থেকে রং-এর অগ্রগতি ঘটে এবং টিউবের গায়ের দাগ থেকে তা পড়ে নেওয়া যায়। বলা বাহুল্য একটি টিউব একবারই ব্যবহার করা যায়। খুব সহজলভ্য নয় তবে যে কেউই এর ব্যবহার শিখে নিতে পারেন। আমদানীকৃত এক একটি টিউবের দাম বর্তমানে পড়ে প্রায় 30–50 টাকা। অবশ্য এর সঙ্গে পাম্প আছে তবে সেটিও খুব দামী নয়। স্কুল, কলেজ, সায়েন্স ক্লাব বা সিটিজেন্স কমিটি এগুলি ব্যবহার করে স্থানীয় কিছু গ্যাস দূষণের প্রাথমিক পরিমাপ পেতেই পারেন।

নিরাপদ মাত্রা ?

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে বায়ু দূষক বিভিন্ন গ্যাস বা কণাপদার্থের নিরাপদ মাত্রা কিছু নির্দিষ্ট আছে কি ? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়—যে সাধারণভাবে বা ঢালাওভাবে এমন কোন মাত্রা নির্দেশ করা সম্ভবও নয় উচিতও নয়। যেমন, বলা যায় না যে বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতির নিরাপদ মাত্রা এই বা ওই। কারণ দেশে দেশে এবং একই দেশের বিভিন্ন স্থানে বাতাসের তাপমাত্রা, জলীয় বাষ্প, দিক, গতি, অন্যান্য দূষকের উপস্থিতি ইত্যাদির উপর তো নির্ভর করেই ক্ষতির পরিমাণ। তাছাড়া মানুষের মধ্যেও শিশু, যুবা বৃদ্ধ, সন্তানবতী মা সকলের ক্ষতি একই মাত্রায় একরকম হতে পারেনা। যেমন হতে পারেনা সব রকমের গাছ-পালার উপরও সমান প্রভাব।

কিন্তু তাব'লে একটা আন্দাজ পাবার মতও কিছু নেই এমন নয়। বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে

এক ধরণের মাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যাদের বলা হয় TLV (Threshold Limit Value)। সঠিকভাবে বলতে গেলে, এগুলি কারখানার পরিবেশে সুস্থ সবল শ্রমিকের জন্যই প্রযোজ্য। নীচের সারণীতে কয়েকটি গ্যাস দূষকের TLV মাত্রা দেওয়া হ'ল ঃ

দূষক গ্যাস	ঊর্ধ্বসীমা (TLV)
কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)	5000 ppm
কার্বন মনোক্সাইড (CO)	50 ppm
অ্যামোনিয়া (NH_3)	25 ppm
সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2)	5 ppm
নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2)	5 ppm
হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)	10 ppm
হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN)	10 ppm
ভিনাইল ক্লোরাইড (C_2H_3Cl)	1 ppm
হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড (HF)	2 mg/m^3

সূত্র ঃ হ্যান্ডবুক অফ ল্যাবরেটারী সেফটি, CRC, (1984)

এসব তথ্যের মূল-উৎস হ'ল আমেরিকা। আমেরিকান কনফারেন্স অফ গভর্নমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাইজিনিস্টস (ACGIH) কর্তৃক নির্ধারিত এইসব ঊর্ধ্বসীমা সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায় যে কারখানার কাজের পরিবেশে একজন সুস্থ সবল শ্রমিক দিনের পর দিন ঐ মাত্রার ঐ গ্যাসের মধ্যে কাজ করলেও তার কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। হ্যাঁ শুধুমাত্র সম্ভাবনার কথাটুকুই বলা যায়। কেননা তথ্যগুলি গড় মাত্র। ব্যক্তিবিশেষের প্রতিক্রিয়ার কোন গ্যারান্টি এর দ্বারা পাওয়া যায় না। এবং সহজবোধ্য যে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সুরক্ষার নিরিখে এই TLV মাত্রা অত্যন্ত বেশী। ভারতের 'ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট,' 1986-তে কাজের পরিবেশে TLV মাত্রা নির্দিষ্ট হয়েছে।

বিশেষ ধরণের কলকারখানা থেকে কি পরিমাণ কণাপদার্থ বা বিশেষ গ্যাসীয় পদার্থ বাতাসে ছাড়া যেতে পারে—তারও একটা সীমা নির্ধারণ করে দেন সংশ্লিষ্ট দেশের দূষণ-নিয়ন্ত্রক নানা সংস্থা বা জাতীয় মানক সংস্থা। যেমন ভারতে, সালফিউরিক অ্যাসিড কারখানা, পেট্রোলিয়াম শোধণাগার, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিমেন্ট শিল্প ইত্যাদির জন্য ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট আছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে সেগুলি শিল্পের প্রতি যথেষ্টই উদার তবুও সরকারী বেসরকারী সব কলকারখানার কর্তৃপক্ষেরই ঐ ঊর্ধ্বসীমা মেনে চলার প্রচন্ড অনীহা!

□ রবীন মজুমদার

কতকগুলো আশঙ্কাজনক তথ্য

□ পৃথিবীতে প্রতিবছর 60 লক্ষ হেক্টর জমি মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে, কোনও প্রাকৃতিক কারণে নয়। অতিরিক্ত পশু-চারণ বৃক্ষচ্ছেদন ও কলকারখানা, যানবাহন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ সহ অন্যান্য মনুষ্যসৃষ্ট কারণে।

□ প্রতিবছর প্রায় এক কোটি হেক্টর গ্রীষ্মকালীন অরণ্য নষ্ট হচ্ছে, যেখানে মোট অরণ্যের পরিমাণ হল নব্বই কোটি হেক্টর।

□ উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীবাণু নিয়ে জৈব বৈচিত্র্যের প্রায় একশ-পঞ্চাশটি প্রজাতি প্রতিদিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র মানুষ কর্তৃক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করার কারণেই।

সূত্র ঃ মার্কিন কাউন্সিলের গ্লোবাল রিপোর্ট 2000

নিরাশ্রয়, নিঃসঙ্গতায় দিন গুনছেন যারা

ধাত্রীবিদ্‌দের এখন রমরমা বাজার। নিত্য নতুন উন্নত থেকে উন্নততর প্রযুক্তি, নামী দামী ওষুধ, ইঞ্জেকশনের সাহায্যে তারা বন্ধ্যা নারীর কোলেও শিশু এনে দিতে সক্ষম। হয় হোক না হাজার হাজার টাকা খরচ। শহুরে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের হাতে এখন খরচ করার মত প্রচুর পয়সা। ডাক্তারদের চোখ এখন শহরের দিকে। এদিকে গ্রামে গঞ্জে সন্তান জন্ম দিতেই প্রতিদিন কত মা বিনাচিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন। অথবা জন্ম দিচ্ছেন মৃত সন্তানের এবং শরীরে তৈরী হচ্ছে একাধিক জটিল রোগ। দরিদ্র দেশগুলোতে বিরল নয় এ ঘটনা। এখানে আফ্রিকার একটি দেশের কথা বলা হচ্ছে। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনের সূত্র ধরে।

মধ্যবয়স্কা এক ইথিওপিয়ান মহিলা মুলির কথা দিয়ে শুরু করা যাক। "বিয়ে হয়েছিল 10 বছর বয়সে, গর্ভবতী হলাম 14তে এসে। টানা ৬ দিন দুঃসহ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করার পর 7 দিনের মাথায় স্বামী নিয়ে এলেন এক হাতুড়ে বদ্যিকে। জন্ম দিলাম মৃত সন্তানের। তারপরই শুরু হল ক্রমাগত মল মূত্র নিঃসরণ, সে এক অদ্ভুত লজ্জাকর অবস্থা। কোনভাবেই একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না, লজ্জায় কারুর সামনে বেরুতে পারি না। ডাক্তার বদ্যির প্রশ্নই ওঠে না। তখনও ভাবি নি স্বামীর ঘরে আমার ঠাঁই নেই। বেশ কয়েকদিন যাবার পর একদিন স্বামী আমাকে বিদায় করলেন আমার মা-বাবার কাছে। স্বামীর ঘরে নতুন বউ এল। দুঃসহ প্রসব বেদনায় কোনরকম চিকিৎসা না পেয়ে অকেজো হয়ে গেল স্থানীয় স্নায়ুতন্ত্র। প্রথম প্রথম হাঁটতে চলতে খুব কষ্ট হত। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে চলা অভ্যাস করলাম। লোকে আমায় দেখে হাসত, ঘেন্নায় কেউ কাছে ঘেঁষত না, বাচ্ছারা ঢিল ছুঁড়ত। বাবা-মা যদ্দিন বেঁচে ছিলেন তবুও দু একজন ভাই-বোন কাছে আসত, এখন আর কেউ আসে না, নিজের রান্নার কাঠ, জল, সবই আমি বয়ে নিয়ে আসি, নিজের রান্না নিজেই করি। এখন আমি 45 বছরের বুড়ি। আদ্দিস আবাবার ফিস্টুলা হাসপাতালে আমার অপারেশন হবে। আবার সুস্থ মানুষের মত সোজা হয়ে হাঁটতে পারব, মিশতে পারব সবার সঙ্গে। তবুও মাঝে মাঝে ক্ষোভে দুঃখে, রাগে জ্বলে আমার শরীর। ভাবি সেই 14 বছর বয়সে যখন ফিস্টুলা হয়েছিল তখনই যদি উপযুক্ত চিকিৎসাটা পেতাম তাহলে এই 31টা বসন্ত যন্ত্রণায় কাটত না আমার।"

কেন হয় এই অবস্ট্রেটিকস্ ফিষ্টুলা ?

জাম্বিয়া থেকে জিম্বাবোয়ে, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া থেকে নাইজেরিয়া এবং ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান সর্বত্রই মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় বিয়ে এবং সন্তান জন্ম দানের মাধ্যমে—অবশ্যই পুরুষ সন্তান। কারণ খেতখামারে কাজ করবে তারাই। আর মেয়েরা যাবে শ্বশুর বাড়ী। তাই 4-5 বছর বয়স থেকেই তাকে ঘরের কাজ যেমন জল আনা, রান্না করা, জ্বলানী কাঠ সংগ্রহ, ছোট ভাইবোনদের দেখাশুনা করা ইত্যাদি হরেকরকম কাজ কর্মে পারদর্শী হতে হয়। ইথিওপিয়ায় 7 বছর বয়স হলে সে চলে যায় তার ভাবী শ্বশুর বাড়ী, সেখানে 12-13 বছর বয়স পর্যন্ত সে ভাবী শ্বাশুড়ির তত্ত্বাবধানে গার্হস্থ্য ধর্মে পটু হতে থাকে। তারপর

বিয়ে। এই সময়টা থেকে অর্থাৎ 13-14 বছর থেকে মেনোপোস পর্যন্ত তাকে ক্রমাগত সন্তান জন্ম দিয়ে যেতে হয়। এটাই রীতি। সন্তান হচ্ছে না শুধুমাত্র এই কারণেই স্বামী তাকে ডিভোর্স করতে পারেন। ফলে এখানে 48 বছর বয়সের পর মেয়েরা সাধারণতঃ আর বাঁচে না।

অপুষ্টি এবং রক্তাল্পতা সঙ্গে নিয়ে বেড়ে ওঠা এই মেয়েদের পেলভিস এমনিই সংকুচিত হয়ে থাকে উপরন্তু চটজলদি বিয়ে এবং শরীর মা হবার উপযুক্ত হবার আগেই তাকে গর্ভবতী হতে হয়। আর প্রসবকালে মেয়েটি যখন দীর্ঘ 6-7 দিন টানা প্রসব যন্ত্রনা ভোগ করে তখন তার পাশে থাকে না কোন চিকিৎসক, দক্ষ নার্স বা আয়া। বাড়ীর লোকের অজ্ঞতা, উদাসীনতা এবং অযত্নে, অবহেলায়, বিনা-চিকিৎসায় মেয়েটি প্রায়শঃই জন্ম দেয় মৃত সন্তানের এবং সাথে সাথে নিজের শরীরে তৈরী হয় ফিস্টুলা। মায়ের মূত্রথলি ও পায়ুনালী বা মূত্রথলি ও যোনীপথের মধ্যে তৈরী হয় এক বিশাল গহ্বর। স্থানীয় স্নায়ুতন্ত্র অকেজো হবার ফলে ঐ গহ্বর দিয়ে ক্রমাগত মল মূত্র নিঃসৃত হতে থাকে। মেয়েটি কোনভাবেই আর একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

এছাড়া বয়স্কদের ক্ষেত্রে ক্রমাগত সন্তান ধারণ এবং বাচ্চা বুকের দুধ খাবার ফলে তার অস্টিও ম্যালয়েশিয়া হয়ে হাড় নরম হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে তার পেলভিস কুঁচকে যায় এবং প্রসবকালে উপযুক্ত চিকিৎসা না পাবার ফলে খুব সহজেই মেয়েটি এই অবস্ট্রেটিকস ফিস্টুলায় আক্রান্ত হয়।

ফিস্টুলায় আক্রান্ত এই মহিলাদের কাছে শারীরিক যন্ত্রনার চাইতেও দুঃসহ মানসিক একাকিত্ব। ঘেন্নার কাছের কোন মানুষ এমনকি স্বামীও তাকে কাছে নেয় না, তার জীবনধারনের জন্য ন্যুনতম প্রয়োজনের দিকেও ফিরে তাকায় না কেউ। এবং অনেক সময় মা-বাবার অবর্তমানে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে লোকালয় থেকে দূরে, নির্জন বনে রেখে আসা হয়। সেখানে অসহায় মেয়েটি বনের কচু ঘেঁচু খেয়ে হয়তো কিছুদিন দিনযাপন করে। নতুবা না খেতে পেয়ে কবে মৃত্যু আসবে এই আশায় দিন গোনে। আর কোন মতে লোকালয়ে আসতে পারলে ভিক্ষান্নে দিন গুজরান করে।

পুরুষ প্রধান এই সমাজে মেয়েটির চিকিৎসা হবে কি না হবে সম্পূর্ণ নির্ভর করে তার স্বামীর সিদ্ধান্তের উপর। স্বামী ব্যক্তিটি অবশ্যই এ ব্যাপারে উদাসীন, কারণ তার কাছে একটা বউ গেলে একশটা আসবে। এটাই নিয়ম, ব্যতিক্রম প্রায় হয়ই না। অবস্ট্রেটিকস ফিস্টুলায় আক্রান্ত একটি মেয়ের স্বামীর বক্তব্য এই রকমঃ অবশ্যই আমার স্ত্রীকে ভালবাসি, কিন্তু এখনকার যা পরিস্থিতি তাতে আর আমাদের একত্রে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে থাকা যায় না। বউ এখন আর আমার জন্য রান্না করতে বা ঘরের কাজ কিছুই করতে পারবে না, সারাদিন জমিতে খাটার পর বাড়ী ফিরে যদি আমাকে দেখার কেউ না থাকে, তাহলে ওর বাবা-মায়ের কাছে চলে যাওয়াই শ্রেয়। তাহলে আমি আমাকে দেখাশোনার জন্য আর একটা বউ আনতে পারি। আমরা গরীব, তাই স্ত্রীকে হাসপাতালে দিতেও পারি না, সবচাইতে বড় কথা, ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চাষবাস করব কখন ?"

কিছু আলো এখনও আছে :

প্রায় 20 বছর আগে 1975 সালে অদ্দিস আবাবায় গড়ে উঠেছিল এক হাসপাতাল, অবষ্ট্রেটিকস্ ফিস্টুলা হাসপাতাল। ডঃ রিজিন্যাল্ড এবং ডঃ ক্যাথেরিনা হ্যামলিনের সহায়তায়। ফিস্টুলায় আক্রান্ত মহিলাদের বিনা পয়সায় অপারেশন করানো হয় এখানে। আজ পর্যন্ত প্রায় 15000 মহিলার অপারেশন হয়েছে এবং হাসপাতালের সাফল্য প্রায় 90 শতাংশ। প্রথমবার সফল না হলে সার্জেনরা 2-3 মাস বাদে পুনরায় অপারেশন করান। বছরে 800-900 রোগীর চিকিৎসা হয় এখানে। সুস্থ মহিলারা অনেক সময়ই আবার তার গ্রামে ফিরে গিয়ে বিয়ে শাদী করে ঘর সংসার করেন।

ডঃ হ্যামলিনের ভাষায় "অনেক সময় এমন কিছু মহিলা আসেন যাদের ক্ষতটা অত্যন্ত মারাত্মক। এক্ষেত্রে অপারেশন হলেও তাদের যোনীপথ এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত থাকে যে তারা আর কোনভাবেই দ্বিতীয় সন্তান বহন করতে পারেন না। অনেক সময়ই এদের নতুন করে মূত্রথলি প্রতিস্থাপনেরও প্রয়োজন হয়। এই মহিলারা আর

কোনভাবেই গ্রামে ফিরে বিয়ে শাদী করে ঘর সংসার করতে পারেন না। ফলে তারা থেকে যান আদ্দিস আবাবার এই হাসপাতালেই এবং এখানকার নানাধরনের কাজকর্ম শিখে যোগ দেন হাসপাতালেই কর্মী হিসেবে। অনেকে আবার অন্য হাসপাতালের গাইনোকলজিষ্টদের সাহায্য করতেও যান। অনেকেই ক্রমশঃ অপারেশন থিয়েটারের কাজকর্মে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ফিষ্টুলায় মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হওয়া এক রোগী এখন শুধু আমাদের কাজে সাহায্য করছেন এমন নয়। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি অপারেশন পর্যন্ত করেন। এবং এনার সাফল্য প্রায় 100 শতাংশ।"

ডঃ হ্যামলিন আরও বললেন যে, সুস্থ হওয়া মেয়েদের আমরা বাড়ীতেই ফেরৎ পাঠাতে চেষ্টা করি। নয়তো তারা শহরের রাস্তায় ভিক্ষে করেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। বাড়ী যাবার পয়সা না থাকলে হাসপাতালের খরচে তাদের বাড়ী ফেরার ব্যবস্থা করে দিই। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার সময় এদের একপ্রস্থ নতুন জামাকাপড় এবং একটা হেল্‌থ কার্ড দেওয়া হয়। এতে কোথায় কিভাবে অপারেশন হয়েছে সব লেখা থাকে। যাতে পরবর্তী শিশু জন্মের সময় তারা সেই কার্ড স্থানীয় হাসপাতালে দেখাতে পারেন। এবং পুনরায় ফিষ্টুলার হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন।

দুঃখের কথা এই হাসপাতালের খবর এখনও পর্যন্ত সবার কাছে পৌঁছায় নি। আক্রান্ত মহিলারা যখন এর কথা জানতে পারেন তখন মাইলের পর মাইল তারা পাড়ি দেন একাকী। কখনো বাসে চেপে, কখনো বা উটের পিঠে আবার কখনও বা স্রেফ পায়ে হেঁটে। আদ্দিস আবাবায় আসার বাসের ভাড়া যোগাড় করতে এক মহিলা টানা একবছর রাস্তায় ভিক্ষে করেছেন এমন ঘটনাও আছে। বাড়ীর লোক সঙ্গী হয়েছে এমন ঘটনা বিরল।

কি করা যেতে পারত :

অথচ কত সহজেই এই সমস্যার সমাধান করা যায়। আদ্দিস আবাবার ফিষ্টুলা হাসপাতালে 18 বছর ধরে কাজ করছেন সিস্টার নেগুলি। তার মতে,—"স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো যদি গর্ভবতী মায়েদের নূন্যতম চিকিৎসাটাও দেয় তাহলেই এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান হতে পারে। এছাড়া চার্চ বা মসজিদের মাধ্যমেও মা-বাবাকে নূন্যতম স্বাস্থ্য সচেতন করা যায়। কিন্তু এখানকার স্বাস্থ্য বাজেটের প্রায় সবটাই চলে যায় শহুরে স্বাস্থ্য খাতে। ফলে গ্রামীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং তার কর্মীরা থাকা না থাকা প্রায় সমান।"

ডঃ আব্রাহামের ভাষায়—"6 বছরে হাজার হাজার টাকা খরচ করে একজন ডাক্তার তৈরীর চাইতেও বেশী প্রয়োজনীয় দক্ষ নার্স এবং ট্রাডিশনাল বার্থ এ্যাটেনডেন্ট (TBA) তৈরীর। কারণ চিকিৎসার প্রাথমিক কাজগুলো এদের মাধ্যমেই করা সম্ভব। কিন্তু দেখা গেছে বছরে 80 শতাংশ টাকা খরচ করে ডাক্তার তৈরী করলেও আসল সমস্যার সমাধানই হয় না। আমরা মনে করি যেসমস্ত গর্ভবতী মহিলার উচ্চতা 150 সে. মি-এর কম, এবং বয়স 18-র নীচে বা 35-এর উপরে এবং বাচ্ছার মাথা উপর দিকে আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রসবকালে উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে ফিষ্টুলায় আক্রান্ত হতেই পারে। এজন্য সন্তান জন্মের আগেই এদের গ্রাম সংলগ্ন হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো উচিত।"

আদ্দিস আবাবার হাসপাতালে চিকিৎসা পেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠা অনেক মেয়েই কিন্তু এখন শ্বশুর বাড়ী স্বামী সন্তানে বীতশ্রদ্ধ বিয়ে করে ঘরসংসার করার চাইতেও তারা অনেক বেশী দামি মনে করে অন্যের সেবা করা। বিশেষত গর্ভবতী মায়েদের পরিচর্যা করা। স্বামী ব্যক্তিটির ছায়াও মাড়াতে চায় না এরা। তাই এই হাসপাতালে চিকিৎকাধীন 16 বছরের অরিগাসের কথা দিয়েই শেষ করা যাক—"3 দিন ক্রমাগত প্রসববেদনা সহ্য করে অবশেষে পায়ে হেঁটে পৌঁছেছিলাম এক স্থানীয় হাসপাতালে. একা। জন্ম নিল মৃত সন্তান। বাড়ী ফেরার পর ফিষ্টুলায় আক্রান্ত আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হল বাপের বাড়ী। না, স্বামী আমাকে একদিনের জন্যও দেখতে আসেনি ; স্থানীয় এক আত্মীয় এবং বাবার সাহায্যে হাসপাতালে পৌঁছেছি আমি। স্বামীর সঙ্গে আর এ জীবনে দেখা করতে চাই না। শুধু তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠে ফিরতে চাই বাড়ীতে-মায়ের কাছে। মা আমার আসন্ন প্রসবা, তাকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব এখন থেকে আমার।

সংকলন ☐ কাজল রায়

সূত্র : প্রাইভেট ডিশিসান ; পাবলিক ডিবেট—উইমেন রিপ্রোডাকশান এ্যান্ড পপুলেশান।

ভূপালের কান্না থামেনি আজও

পরিক্রমা : এক

ভূপালের সেই ভয়ংকর গ্যাস দুর্ঘটনার কথা ভোলেননি নিশ্চয় কেউই। 1984 সালের দোসরা ডিসেম্বরের রাত। ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছিল বিষাক্ত মিথাইল আইসো-সায়ানাইড গ্যাস। কারখানার চারপাশের এলাকায় ছড়িয়ে দিয়েছিল মৃত্যুর বিভীষিকা। ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল হাজার খানেক নারী পুরুষ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শিশু। ঘুম চোখে দিশেহারা হয়ে ছুটে বেরিয়েছে মানুষ। হাজার হাজার গবাদি-পশু মরেছে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষ পালিয়েছে শহর ছেড়ে। অবর্ণনীয় দুর্দশায় কাটিয়েছেন কয়েকটি দিন।

তারপর কেটে গেছে এগারো বছর। কাটেনি গ্যাস পীড়িত মানুষদের দুর্গতি। চিকিৎসা, রিলিফ, পুনর্বাসনর কথা যত শোনা গেছে তার চেয়ে বেশী শোনা গেছে এসব নিয়ে বিতর্ক এবং কারচুপি। দোষীকে সাব্যস্ত করতে বিস্তর কুটকাচালি হয়েছে কোর্ট প্রাঙ্গনে। মীমাংসা হয়নি আজও।

সেদিনের গ্যাস আক্রান্ত যারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন পরবর্তীকালে বাঁচেননি নানান রোগ ব্যাধির প্রকোপ থেকে। প্রত্যাশিত ছিল এই পরিণাম। আজও হাজার হাজার মানুষ ফুসফুস, পেট, চোখ, হাড়, ও নার্ভের অসুখ নিয়ে হাসপাতালের দোরে দোরে ঘুরছেন। অর্থাভাবে হাসপাতাল নিজেই ধুঁকছে। তা সত্ত্বেও দিনে অন্তত হাজার চারেক গ্যাস পীড়িত মানুষ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র-গুলিতে হাজিরা দিচ্ছেন। মাসে গড়ে জনা পনের মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন।

ক্ষতিপূরণের আশা নিয়ে আজও বহু মানুষ অপেক্ষারত। স্বভাবতঃই কিছু অসাধু লোক সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। সেই কারচুপি ঠেকানোর নামে হয়রান করা হচ্ছে বহু প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে। যেমন কোর্ট থেকে অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল বিভিন্ন দাবীর যথার্থতা খতিয়ে দেখার জন্য। সেই অফিসারের দেওয়া সুপারিশের ভিত্তিতেও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি সকলকে।

এদিকে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কর্মকেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা হয়েছিল তার বেশীর ভাগই আজ বন্ধ। সাময়িক কাজ পাওয়া বেশ কয়েক হাজার নারী পুরুষ পুনরায় কর্মহীন। ওয়ার্কশেড গুলোর বেশীর ভাগ খালি পড়ে আছে। আর কিছু কিছু শেডের দখল নিয়েছে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী। —ছাউনির ব্যবস্থা হয়েছে ওই শেডে!

BA (Love) Hons কোর্স

পরিক্রমা : দুই

সাতাশে ডিসেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকায় অধ্যাপক মানস জোয়ারদারের একটি লেখা থেকে জানা গেল—"বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ বিকাশের জন্য কর্মসূচী গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। আদর্শনিষ্ঠা, ধর্মনিরপেক্ষতা, ভ্রাতৃত্ব-বোধ, গণতান্ত্রিকতা, সামাজিক সমতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এসব বিষয়ে ছাত্র-শিক্ষক সকলকে উদ্বুদ্ধ করাই এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য বলে বলা হয়েছে। এছাড়া দরিদ্র এবং অশক্ত লোকজনদের উপর মমত্ব, কায়িকশ্রম এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, শান্তি, অহিংসা পরিবেশ সচেতনতা এ সব বিষয়েও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করা হবে। এ বাবদ খরচ হবে আট কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা।"

টাকার অঙ্ক ঘোষণা হয়ে গেছে যখন কোর্স তবে চালু হচ্ছেই। স্টেটসম্যান পত্রিকা একটি সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। ওনাদের প্রস্তাব ডিগ্রিটা হোক BA. (Love) Hons। তবে ওদের সংশয় আর পাঁচটা পাঠ্যক্রমের মত এদেরও ট্রেনিং. যদি ওইরকমই হয় তো অহিংসা প্রেম ইত্যাদির প্রয়োগও তো ঠিকভাবে হবে না!—না হওয়াই ভাল। ঠিকঠাক হলে তো আরেক বিপদ। হিন্দি সিনেমা, ভুল রাজনীতি ইত্যাদিতে বুঁদ না হয়ে যদি এরা ঠিকঠাক যা যা হওয়া উচিত তাই করার কথা ভাবে তা'লে? সে ধাক্কা কে সামলাবে?

আমার মনে হয় না তেমন সম্ভাবনা আছে। কারণ গোটা প্রকল্পের দায়িত্বে তো থাকছেন রাজনীতিক তথা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসকেরা। শিক্ষার নিয়োগের জন্য 'সিলেকশন কমিটি' গড়বেন তো এরাই। তা'লে আর চিন্তা কি? অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা দেখে কি এ ব্যাপারে কারুর সন্দেহ আছে?

এখন অন্য ব্যাপারে বরং মাথা ঘামানো দরকার। এদের সিলেবাস কি হবে। টেক্সট বই কোথা থেকে আসবে ইত্যাদি। এ ব্যাপারে গুণীজনদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা যেতে পারে। কোর্স একবার চালু হয়ে গেলে ছাত্রের অভাব হবে না। সমস্যা দেখা দেবে তার পরেই। পাশ করে বেরিয়ে কোন কাজে লাগবে এরা? কোথায় চাকুরি হবে? আজকের দিনে তো কোন কাজেই এসব গুণাবলীর প্রয়োজন হয় না। বরং এখন থাকলেই বিপদ। উন্নতির পথে বাধা হয়।—তা'লে?

আমার একটা প্রস্তাব আছে। মন্ত্রীদের বক্তৃতা লিখিয়ের পোষ্টে এদের নিয়োগ করা যায় না? তাহলে চালু হোক B. A. (Love) Hons কোর্স!

খৃস্‌মাসে ফরাসী উপহার

ফরাসী সরকার গোঁয়াতুর্মি ছাড়েনি এখনও। পরমাণু বোমার পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন যথারীতি। বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ উপেক্ষা করে। শুরু হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিবাদ উঠেছে মূলতঃ পরীক্ষাস্থল সংলগ্ন এলাকার দেশগুলি থেকে। ভাল হত প্রতিবাদ যদি উঠত তেমন দেশ থেকে যাদের হুমকিতে কাজ হয়। তা হয়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নীরব এব্যাপারে। ছোটখাট (!) ব্যাপার বলে কি ? জানা নেই।

এদিকে নোবেল পীস কমিটি এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণায় বেশ চমক সৃষ্টি করেছেন। পুরস্কার দিয়েছেন একজন পরমাণু অস্ত্র বিরোধী আন্দোলনের প্রবীন সংগঠককে। নাম মিঃ যোশেফ রটব্লাট। পুরস্কার ঘোষণার সময়টি তাৎপর্যপূর্ণ। অক্টোবর মাস। ঘুরুরোয়া আটোলের প্রবালদ্বীপে পরীক্ষামূলক ফরাসী পারমানবিক বোমার বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে দুনিয়াজুড়ে প্রবল বিক্ষোভ আন্দোলন চলছিল তখন। সম্ভবতঃ নোবেল পীস কমিটি এই ঘোষণার মাধ্যমে ফরাসী সরকারের কাছে তাদের প্রতিবাদ বার্তাটি পেঁাছে দিতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু কাজ হয়নি এতে। বিফলে গেছে তাদের সংকেত-বার্তা। ফরাসী সরকার উত্তর দিয়েছেন বটে একটা। তবে চিঠি লিখে কিংবা ডিপ্লোম্যাট পাঠিয়ে নয়। আরেকটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। এর পরেও বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন তারা। 1995-এর শেষ সপ্তাহে। খৃস্‌মাস উপলক্ষ্যে বিশ্ববাসীর জন্য ফরাসী উপহার ! ☐ র. চ.

আবেদন

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকার 1995 সালের চারটি সংখ্যা একত্রে পাওয়া যাচ্ছে। মূল্য ঃ 20 টাকা (ডাক খরচ সহ) 1996 সালের জন্য গ্রাহক হোন।

☐ গ্রাহক চাঁদা ঃ ব্যক্তি—বার্ষিক 16 টাকা (ডাক যোগে 20 টাকা)

☐ বিশেষ ক্ষেত্রে 10 টাকা (ডাক যোগে 14 টাকা)

☐ প্রতিষ্ঠান ঃ বার্ষিক 50 টাকা (ডাক খরচ সহ)

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'—এই নামে ব্যাংক-ড্রাফট বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। কুপনের নীচে স্পষ্টভাবে নাম-ঠিকানা লিখবেন।

☐ পুরনো বি ও বি-র সংখ্যার জন্য যোগাযোগের ঠিকানায় লিখুন।

আর এন 34929/79
সপ্তদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর '95

একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে অভিজিত লাহিড়ী
পি 252, লেক টাউন,
ব্লক এ. কলকাতা-700089

বই মেলায় আসুন

প্রতিবারের মত এবারেও আমরা আছি
ছোট পত্র-পত্রিকার নির্দিষ্ট ছাউনিতে

বহুদিন প্রতীক্ষার পর ফের প্রকাশিত হল

হোমিওপ্যাথি বুকলেট

বি জ্ঞা ন ও বি জ্ঞা ন ক র্মী

'বি ও বি'র

বন্ধু ও শুভাকাঙ্খীদের সারাদিনের বৈঠকে আসছেন কি ?

জেনে রাখুন দিনক্ষণ, স্থান

17 ~~17~~ মার্চ 1996 ~~শনিবার~~ রবিবার

মুদিয়ালীর নেচার পার্ক (ব্রেসব্রীজের কাছে)

যাঁরা কাজ করেছেন : কম্পোজ □ গীতশ্রী সেন, স্বপন সেন, দুলাল বোস ।। মেক-আপ □ স্বপন সেন ।।
মেশিনম্যান □ মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ।। বাইণ্ডিং □ লক্ষণ দাস ।। মুদ্রক □ সমুদ্র ঘোষ।
বি ও বির পক্ষ থেকে : শান্তনু, প্রদীপ, রবীন, স্বপন, রবীন।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি,
117, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-9 থেকে মুদ্রিত, ফোন : 350-7967।